উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত । ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে । পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে । জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে । শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]

Course Type: **Discipline Specific Elective (DSE)**

Course Title: **Child Development and Pedagogy**

Course Code: **NEC-ED-04**

1st Print: March, 2025

Print Order: SC/DTP/25/148. 21/03/25

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission –Distance Education Bureau

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Arts in Education (Honours) (<Education>) [<NED>]

Course Type: **Discipline Specific Elective (DSE)**

Course Title: **Child Development and Pedagogy**

Course Code: **NEC-ED-04**

Board of Studies

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Sibaprasad De
Professor, *SoE, NSOU*

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, *SoE, NSOU*

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Course Writer
Dr. Chandan Adhikary
Associate Professor
Dept. of Education, Burdwan University

Course Editor
Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Format Editor
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Notification

All rights are reserved. No part of this Self-Learning Material (SLM) should reproduce in any form without permission in writing from the Registrar of Netaji Subhas Open University.

Smt. Ananya Mitra
Registrar (Addt'l Charge)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Child Development and Pedagogy
Course Code: NEC-ED-04

BLOCK-1	**The Child**	
Unit 1	Child Development: Concept, Nature and its Significance	6-11
Unit 2	Principles of Child Development	12-14
Unit 3	Socialisation Processes: Child and Social World	15-24
BLOCK- 2	**Child Centered Progressive Education**	
Unit 4	Constructs and Critical Perspectives of Development: Piaget, Kohlberg and Vygotsky	25-32
Unit 5	Child Centered and Progressive Education	33-40
Unit 6	Individual Difference among learners: Diversity of Language, Caste, Gender, Community and Religion	41-49

BLOCK-3	**Children: Perspectives**	
Unit 7	Intelligence: Multi-Dimensional Constructs of Intelligence Addressing the Talented and Creative Learners in Schools	50-66
Unit 8	Addressing Socio-Culturally Marginalized and Specially Challenged Learners in the Classroom	67-77
Unit 9	Gender as a social construct; gender roles, gender-bias and educational practices	78-90
BLOCK-4	**Language, Learning & Critical Thinking**	
Unit 10	Language, Thought Process of Learners, Learning and Critical Thinking	81-95
Unit 11	Learning Process through Children's Strategies, Social Context and Social Activities	96-98
Unit 12	Alternative Conception of Learning: Child as a Problem Solver and a Scientific Investigator	99-101
BLOCK -5	**Teaching-Learning and Assessment**	
Unit 13	Factors Contributing to learning and Teaching: Personal (Cognition, Emotion and Motivation) and Environmental	102-105
Unit 14	Teaching-Learning Materials: Textbooks, Multi-Media, Multilingual Resources of the Classrooms and Remedial Teaching	106-108
Unit 15	Evaluating Learner Achievement: Entry Level Continuous and Comprehensive and Outcome Based Evaluation; Preparing Results: Scoring, Grading, and other Components.	109-117

ব্লক-১ শিশু

একক: ১ শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত ধারণা, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য (Concept, Nature and significance of Child' Development)

১. ১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

- শিশুর বিকাশ কী তা বুঝতে পারবে।
- শিশুর বিকাশের প্রকৃতি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১. ২ ভূমিকা (Introduction)

শিশুর বিকাশ এমন একটি প্রক্রিয়া, যা জন্মের আগের পর্যায় (ভ্রূণকাল) থেকে শুরু হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এটি কেবল শারীরিক পরিবর্তন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও সামাজিক গঠনের একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারা। প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ধরণ ভিন্ন হয়, এবং এটি জিনগত বৈশিষ্ট্য (heredity) এবং পরিবেশগত উপাদান (environment) দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর চারপাশের পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং সংস্কৃতিগত উপাদান তার মানসিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিকাশের এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট স্তর ও পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে। শিশুর বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রক্রিয়া যা তার ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাগত দক্ষতা, সামাজিক আচরণ এবং আবেগগত সুস্থতার ভিত্তি তৈরি করে। এটি শুধুমাত্র জিনগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, বরং লালন-পালন, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা এবং সমাজও এই বিকাশে বড় ভূমিকা রাখে। শিশুর বিকাশের ধাপগুলি সঠিকভাবে বোঝা এবং তাকে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, শিশুর বিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল গবেষক ও শিক্ষকদের জন্য নয়, বরং অভিভাবক, চিকিৎসক ও নীতিনির্ধারকদের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১.৩ শিশুর বিকাশের ধারণা (Cncept of Child's' Devevelopment)

শিশুর বিকাশ বলতে আমরা বুঝি জন্ম থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় ও নৈতিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তন। এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশু শিখতে, মানিয়ে নিতে এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করতে শেখে। বিকাশ শুধুমাত্র বয়স বাড়ার বিষয় নয়, এটি চিন্তাভাবনা, ভাষা শেখা, সামাজিক সম্পর্ক গঠন, আবেগ প্রকাশ, মূল্যবোধ শেখা ও শারীরিক দক্ষতার উন্নয়ন বোঝায়।

শিশুর বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র (Areas of Child's Development)

শিশুর বিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়, যা তার সামগ্রিক গঠনকে প্রভাবিত করে , প্রতিটি বিভাগের অন্তর্গত প্রধান বিষয়গুলিকে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো—

১. শারীরিক বিকাশ (Physical Development)

- উচ্চতা, ওজন বৃদ্ধি, হাড় ও পেশির গঠন।

- চলাফেরা ও সমন্বয়ের দক্ষতা (মোটর স্কিল)।

- মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধি।

২. জ্ঞানীয় বিকাশ (Cognitive Development)

- চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, স্মৃতিশক্তি।

- ভাষা শেখা ও যোগাযোগ দক্ষতা।

- নতুন তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করার ক্ষমতা।

৩. সামাজিক বিকাশ (Social Development)

- বন্ধু ও পরিবারের সাথে সম্পর্ক গঠন।

- সামাজিক নিয়মকানুন শেখা ও ব্যবহার করা।

- দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন।

৪. আবেগীয় বিকাশ (Emotional Development)

- আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস ও আবেগ প্রকাশের দক্ষতা।

- ভয়, রাগ, আনন্দ ও দুঃখের মতো আবেগগুলোর বিকাশ।

- সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আবেগীয় সংযোগ গড়ে তোলা।

৫. নৈতিক বিকাশ (Moral Development)

- সঠিক-ভুলের ধারণা তৈরি।

- সামাজিক মূল্যবোধ গঠন ও ন্যায়বিচারের ধারণা শেখা।

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

১.৪ শিশুর বিকাশের প্রকৃতি Nature of Child's Development)

শিশুর বিকাশ একটি জটিল, গতিশীল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটে, যা শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে এর কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

১. বিকাশ ক্রমধারায় ঘটে (Development is Sequential)

শিশুর বিকাশ একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটে। প্রথমে মাথা ধরে রাখা শেখে, তারপর বসতে শেখে, তারপর হাঁটতে শেখে। প্রথমে অস্পষ্ট শব্দ

উচ্চারণ করে, পরে ছোট বাক্য গঠন করতে শেখে।

২. বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Development is Continuous)

বিকাশ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা একদিনে ঘটে না। শিশু একদিনে কথা বলা শিখে না, এটি ধাপে ধাপে শেখে। আবেগ, চিন্তা ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশ সময়সাপেক্ষ।

৩. বিকাশ সাধারণ থেকে নির্দিষ্টের দিকে অগ্রসর হয় (Development Proceeds from General to Specific)

শিশু প্রথমে সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেয়, পরে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করে। জন্মের পর শিশু পুরো হাত নাড়িয়ে কিছু ধরতে চায়, পরে নির্দিষ্ট আঙুল ব্যবহার করে ছোট বস্তু তুলতে শেখে।

৪. শিশুর বিকাশের হার ভিন্ন হতে পারে (Development Varies from Child to Child)

সব শিশু একভাবে বিকশিত হয় না। কেউ ১০ মাসে হাঁটতে শেখে, কেউ ১৪ মাসে। কেউ দ্রুত কথা বলতে শেখে, কেউ ধীরে ধীরে শেখে।

৫. বিকাশ পরিবেশ ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে (Development is Influenced by Heredity and Environment)

জিনগত বৈশিষ্ট্য: শিশুর শারীরিক গঠন, চোখের রং, উচ্চতা প্রভৃতি বংশগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

পরিবেশ: শিশুর পরিবারের অবস্থা, পুষ্টি, শিক্ষার সুযোগ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিকাশকে প্রভাবিত করে।

১.৫ শিশুর বিকাশের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব (Singnificance and Importance of Child's Development)

শিশুর বিকাশ শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি সমাজ, শিক্ষা এবং জাতির ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর বিকাশের গুরুত্ব বোঝার মাধ্যমে আমরা তাকে আরও ভালোভাবে গাইড করতে পারি এবং তার সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। এই অধ্যায়ে আমরা শিশুর বিকাশের বিভিন্ন দিক এবং এর প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করব।

শিশুর বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Child's Development)

শিশুর বিকাশের গুরুত্ব কয়েকটি মূল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং নৈতিক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব ফেলে।

১. শারীরিক বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Physical Development)

শিশুর শারীরিক বিকাশ তার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জীবনের গুণগত মান নির্ধারণ করে।

a. সুস্থ শরীর ও মানসিক বিকাশ: শিশু যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, তবে তার মস্তিষ্কের বিকাশও সুষ্ঠুভাবে হয়, যা তাকে শেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

b. সুস্থ অভ্যাস গড়ে ওঠা: প্রাথমিক বয়সে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়াম শিশুর ভবিষ্যৎ সুস্থতার ভিত্তি তৈরি করে।

c. আত্মনির্ভরশীলতা: শিশু যখন হাঁটতে শেখে, খেতে শেখে, খেলাধুলা করতে শেখে, তখন তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়।

২. জ্ঞানীয় বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Cognitive Development)

শিশুর চিন্তা করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং শেখার আগ্রহ তার জ্ঞানীয় বিকাশের ওপর নির্ভর করে।

a. শিক্ষাগত সাফল্য: শিশুর বিকাশ যত বেশি সুষ্ঠু হবে, সে ততই দ্রুত নতুন জিনিস শিখতে পারবে।

b. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: জ্ঞানীয় বিকাশ শিশুকে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে শেখায়, যা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

c. সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন: শিশুর চিন্তন দক্ষতা যত বেশি বিকশিত হবে, সে তত বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠবে।

৩. সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Social Development)

শিশু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং তার সামাজিক আচরণ ও যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে ওঠার মাধ্যমে সে সমাজে কার্যকরভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে।

a. সুস্থ সম্পর্ক গঠন: শিশুর সামাজিক বিকাশ তাকে পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

b. সহযোগিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি: সামাজিক বিকাশ শিশুকে দলগতভাবে কাজ করতে, নেতৃত্ব দিতে এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায়।

c. সামাজিক মূল্যবোধ শেখা: শিশু যখন সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যায়, তখন সে ন্যায়, সততা, সহযোগিতা ও সহানুভূতির মতো গুণাবলি অর্জন করে।

৪. আবেগীয় বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Emotional Development)

শিশুর আবেগীয় বিকাশ তাকে নিজের আবেগ বোঝা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যদের আবেগ অনুভব করার ক্ষমতা দেয়।

a. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সহনশীলতা: শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার আচরণগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

b. মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস: আবেগীয় বিকাশ শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত রাখে।

c. আত্ম-পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব গঠন: আবেগীয় বিকাশ শিশুর আত্মপরিচয় গঠনে সাহায্য করে, যা তার ভবিষ্যতের ব্যক্তিত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. নৈতিক বিকাশের গুরুত্ব (Importance of Moral Development)

শিশুর নৈতিক বিকাশ তাকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

a. নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: শিশুর নৈতিক বিকাশ তাকে ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা দেয়।

b. সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ: নৈতিকতা শিশুকে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায় এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

c. সুদূরপ্রসারী প্রভাব: নৈতিকতা শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণে প্রভাব ফেলে এবং কর্মজীবনেও তাকে সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

১. ৬ সারাংশ (Summary)

শিশুর বিকাশ একটি ক্রমবর্ধমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা জন্মের আগের সময় থেকে শুরু হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত চলে। এটি শুধুমাত্র শারীরিক পরিবর্তন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয়, সামাজিক এবং নৈতিক গঠন সম্পর্কিত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শিশুর বিকাশের প্রকৃতি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটে, যেমন ক্রমান্বয়ে ও ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়, সাধারণ থেকে নির্দিষ্টের দিকে অগ্রসর হয়, এবং পরিবেশ ও জিনগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর বিকাশ বিভিন্ন স্তরে ঘটে, যেমন শারীরিক, জ্ঞানীয়, সামাজিক, আবেগীয় এবং নৈতিক বিকাশ। শারীরিক বিকাশে শিশুর উচ্চতা, ওজন, এবং পেশী গঠন হয়, জ্ঞানীয় বিকাশে চিন্তা-চেতনা ও ভাষা শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বিকাশে সম্পর্ক গঠন ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, আবেগীয় বিকাশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সহানুভূতি শিখতে পারে, এবং নৈতিক বিকাশে সঠিক-ভুল বোঝা ও ন্যায়বিচার গড়ে ওঠে।এই বিকাশের প্রক্রিয়া শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

1.7 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

1. আপনার মতে, শিশুর বিকাশের কোন ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন এবং কেন?
2. শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং মানসিক বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে বোঝানো যায়?
3. শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? আপনি কি মনে করেন যে পরিবেশের পরিবর্তন শিশুর বিকাশে বড় প্রভাব ফেলতে পারে?

4. বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আপনি কোন স্তরটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং মনে করেন এবং কেন?
5. আপনি কীভাবে নিশ্চিত করবেন যে একটি শিশুর আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ যথাযথভাবে ঘটছে?

৮.১ তথ্যসূত্র (Bibliogaphy)

- Erikson, E. H. (১৯৬৩). *Childhood and Society.* Norton & Company.
- Santrock, J. W. (২০২১). *Life-Span Development.* McGraw Hill.
- Berk, L. E. (২০২০). *Development Through the Lifespan.* Pearson.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- Mussen, P. H., Conger, J. J., Kagan, J., & Huston, A. C. (১৯৯৯). *Child Development and Personality.* Harper & Row.

একক: ২ শিশুর বিকাশের নীতি (Principles of Child Development)

২. ১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

- শিশুর বিকাশের ধারাবাহিকতা এবং নির্দিষ্ট ক্রম বোঝা।
- বিকাশের বিভিন্ন দিক (শারীরিক, মানসিক, আবেগীয় ও সামাজিক) পরস্পরের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করা।
- বংশগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত প্রভাব কিভাবে শিশুর বিকাশের গতি এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করা।
- শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব ও তার বিকাশে প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

২. ২ ভূমিকা (Introduction)

শিশুর বিকাশ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক এবং নৈতিক বিকাশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। এই বিকাশ বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যা মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা শিশুর বিকাশের নীতিগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

২.৩ শিশুর বিকাশের নীতিসমূহ (Principles of Child Development)

১. বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Development is Continuous)

শিশুর বিকাশ একটি ক্রমাগত চলমান প্রক্রিয়া যা শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যদিও বিকাশের গতি ভিন্ন হতে পারে, তবে এটি কখনোই হঠাৎ থেমে যায় না।

২. বিকাশ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে (Development Follows a Sequential Order)

শিশুর বিকাশ নির্দিষ্ট ক্রমে ঘটে, যেমন—

- প্রথমে শিশু মাথা ও ঘাড় নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, তারপর বসতে, দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখে (Cephalocaudal Development) ।
- শিশুর বিকাশ কেন্দ্র থেকে বাহিরের দিকে অগ্রসর হয়, যেমন—প্রথমে বাহু নাড়াতে শেখে, তারপর আঙুলের ব্যবহার শেখে (Proximodistal Development) ।

৩. বিকাশের হার শিশুভেদে ভিন্ন হতে পারে (Rate of Development Varies from Child to Child)

প্রত্যেক শিশুর বিকাশের গতি আলাদা হতে পারে। কেউ দ্রুত হাঁটতে শেখে, কেউ দেরিতে শেখে, তবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সবাই শিখে।

৪. বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র পারস্পরিক সংযুক্ত (Different Aspects of Development are Interrelated)

শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, শিশুর ভাষা বিকাশ তার সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

৫. বিকাশের সংবেদনশীল সময়কাল (Sensitive Periods in Development)

শিশুর বিকাশের কিছু নির্দিষ্ট সময় থাকে যখন সে সহজেই নতুন কিছু শিখতে পারে। যেমন, ভাষা শেখার জন্য ০-৫ বছর পর্যন্ত সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. পরিবেশ ও জিনগত প্রভাব (Influence of Heredity and Environment)

শিশুর বিকাশ তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। যেমন, শিশুর উচ্চতা নির্ভর করে তার জিনের ওপর, কিন্তু পুষ্টি ও যত্নের অভাবে সে স্বাভাবিক উচ্চতায় পৌঁছাতে নাও পারে।

৭. বিকাশ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঘটে (Development Occurs through Active Participation)

শিশুর বিকাশ শুধুমাত্র শেখানো বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হয় না; বরং সে নিজেই পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে শেখে।

৮. বিকাশ গঠিত হয় শেখার মাধ্যমে (Learning and Development are Closely Related)

শিশুর বিকাশ তার শেখার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। শিশুরা অনুকরণ, অনুসন্ধান, ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন কিছু শেখে।

৯. বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্বারা পরিচালিত (Development is Influenced by Social and Cultural Contexts)

শিশুর বেড়ে ওঠা, ভাষা, আচরণ ও মূল্যবোধ সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১০. শিশুর বিকাশের জন্য মানসিক সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ (Emotional Well-being is Crucial for Development)

শিশুর আবেগিক নিরাপত্তা, ভালোবাসা, ও সঠিক লালন-পালন তার আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিশুর বিকাশের এই নীতিগুলো শিশুর বেড়ে ওঠা, শেখার প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের দায়িত্ব হলো শিশুর জন্য একটি ইতিবাচক ও সমৃদ্ধশালী পরিবেশ তৈরি করা, যাতে তারা সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

২.৪ সারাংশ (Summary)

শিশুর বিকাশ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ঘটে। এটি ধারাবাহিক এবং নির্দিষ্ট ক্রমে ঘটে, তবে প্রতিটি শিশুর বিকাশের গতি আলাদা হতে পারে। বিকাশের বিভিন্ন দিক একে অপরকে প্রভাবিত করে, যেমন ভাষা বিকাশ সামাজিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। শিশুর বিকাশ তার বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

বিকাশের কিছু সংবেদনশীল সময়কাল থাকে, যেমন ভাষা শেখার জন্য ০-৫ বছর পর্যন্ত সময় গুরুত্বপূর্ণ। বিকাশ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঘটে এবং এটি শেখার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শিশুর বিকাশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং আবেগিক সুস্থতা তার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিক্ষকদের এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব শিশুর জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে। অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের দায়িত্ব হলো শিশুর জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে সে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

২.৫ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

- শিশুর বিকাশের ধারাবাহিকতা কীভাবে কাজ করে? এর উদাহরণ দিন।
- বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে?
- শিশুর বিকাশে পরিবেশ এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা কীভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রভাবিত করে?
- বিকাশের সংবেদনশীল সময়কাল কী এবং শিশুর ভাষা শেখার জন্য কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?
- একটি শিশুর বিকাশে মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব কীভাবে তার শিখন ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে?

2.6 তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Santrock, J. W. (২০২১). *Life-Span Development.* McGraw Hill.
- Berk, L. E. (২০২০). *Development Through the Lifespan.* Pearson.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- Piaget, J. (১৯৫২). *The Origins of Intelligence in Children.* W. W. Norton.
- রাষ্ট্রপুঞ্জ শিশু অধিকার সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC)

একক: ৩ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া: শিশু এবং সামাজিক বিশ্ব (Socialization Processes: Child and Social World)

৩. ১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

1. শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া এবং এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা, যা তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
2. সামাজিকীকরণের বিভিন্ন স্তর, যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিকীকরণ, এর মাধ্যমে শিশুর সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশ কিভাবে ঘটে তা বিশ্লেষণ করা।
3. শিশুদের ভাষা, যোগাযোগ দক্ষতা, এবং সামাজিক দক্ষতার বিকাশের সাথে সামাজিকীকরণের সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
4. এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের আলোকে শিশুদের মনোবিকাশ এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর এর প্রভাব পর্যালোচনা করা।

৩. ২ ভূমিকা (Introduction)

শিশু জন্মগ্রহণের পর একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠে। সমাজের সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হয় পারিবারিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার মাধ্যমে। শিশু কীভাবে সমাজের নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, আচরণ, ও ভূমিকা শেখে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করে, সেই প্রক্রিয়াকেই সামাজিকীকরণ (Socialization) বলা হয়। এটি শিশুকে সমাজের উপযোগী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং তার সামাজিক বিকাশের মূল ভিত্তি স্থাপন করে।

৩.৩ সামাজিকীকরণের ধারণা (Concept of Socialization)

সামাজিকীকরণ (Socialization)

সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি ছোটবেলা থেকেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শেখার মাধ্যমে সমাজের মূলনীতি, আচরণ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এটি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু কেবলমাত্র ভাষা, আচার-আচরণ বা যোগাযোগ কৌশল শেখে না, বরং সমাজের নিয়ম-কানুন, সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণকে সহজভাবে বলা যেতে পারে—একটি শিশুর সমাজের সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া, যেখানে সে বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলি ও সংস্কৃতি রপ্ত করে। এই প্রক্রিয়ায় তার চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, আত্মপরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ও সামাজিক দক্ষতা গড়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialization)

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে।

১. এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Lifelong Process)

সামাজিকীকরণ শুধুমাত্র শৈশব বা কৈশোরে ঘটে না, এটি পুরো জীবনব্যাপী চলতে থাকে। যদিও শিশুকালে সামাজিকীকরণের ভিত্তি তৈরি হয়, তবে ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন সামাজিক অভিজ্ঞতা ও ভূমিকার মাধ্যমে এটি চলমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তখন তার পেশাগত সামাজিকীকরণ ঘটে, যেখানে সে নতুন কাজের পরিবেশ, সংস্কৃতি ও আচরণ শিখে।

২. এটি একটি সচেতন ও অবচেতন প্রক্রিয়া (Both Conscious and Unconscious Process)

সামাজিকীকরণ কখনও সচেতনভাবে হয়, আবার কখনও অবচেতনভাবেও ঘটে। শিশুকে যখন পরিবার বা শিক্ষক শৃঙ্খলা, সৌজন্যবোধ বা মূল্যবোধ শেখান, তখন এটি সচেতন সামাজিকীকরণ। কিন্তু যখন একটি শিশু বাবা-মার আচরণ অনুকরণ করে, তখন এটি অবচেতন সামাজিকীকরণ।

৩. সামাজিকীকরণ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে (Sequential and Structured Process)

সামাজিকীকরণের ধাপগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে। শিশুকালে পরিবার থেকে শুরু হয়ে এটি বিদ্যালয়, বন্ধুবান্ধব, ধর্ম, গণমাধ্যম এবং কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৪. এটি পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল (Influenced by Family, Society, and Culture)

সামাজিকীকরণ শিশুদের সমাজের নিয়ম-কানুন শেখার জন্য শুধুমাত্র পরিবারের উপর নির্ভরশীল নয়, এটি বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতির সাথেও সংযুক্ত। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

৫. এটি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে (Establishes Relationship Between Individual and Society)

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি তাকে সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে, যেখানে সে সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে এবং তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে।

৬. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ঘটায় (Develops Language and Communication Skills)

শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ভাষা শেখার মাধ্যমে সে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে শেখে এবং অন্যদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে।

৭. এটি শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে সহায়তা করে (Develops Values and Morality)

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এবং দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের অন্যান্য অংশ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিকীকরণের গুরুত্ব (Importance of Socialization)

সামাজিকীকরণ শিশুর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এটি শিশুর সামাজিক, আবেগিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

১. ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক (Helps in Personality Development)

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু তার নিজস্ব আত্মপরিচয় গড়ে তোলে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এটি তাকে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে শেখায়।

২. সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে (Develops Social Skills)

শিশু কিভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে আচরণ করতে হবে, কীভাবে অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে হবে—এসব কিছু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শেখে।

৩. আচরণগত নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলে (Develops Behavioral Control and Discipline)

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের নিয়ম শিখে, যা তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

৪. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে (Strengthens Social Bonds)

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু তার পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সংযুক্ত হতে শেখে। এটি তার সামাজিক ও আবেগিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

৫. সমাজের মূলনীতি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তৈরি করে (Preserves Social Norms and Culture)

প্রত্যেক সমাজ তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সামাজিকীকরণের উপর নির্ভর করে। এটি সমাজের ঐতিহ্য ও পরিচয় সংরক্ষণে সাহায্য করে। সামাজিকীকরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এটি তাকে সমাজের সাথে সংযুক্ত করে, সামাজিক দক্ষতা শেখায়, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশ ঘটায় এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। সামাজিকীকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধু, ধর্ম, গণমাধ্যম এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। সঠিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একটি শিশু ভবিষ্যতে সুস্থ, সফল এবং সমাজের জন্য উপযোগী একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

৩.৪ শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া (Process of Socialization in Children)

সামাজিকীকরণ একটি শিশুকে ধাপে ধাপে সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আচরণ এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এটি একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া, যা পরিবার, বিদ্যালয়, সহপাঠী, গণমাধ্যম এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপে সম্পন্ন হয়—

১. প্রাথমিক সামাজিকীকরণ (Primary Socialization)

এই পর্যায়ে শিশুর সামাজিকীকরণ তার পরিবারের মাধ্যমে শুরু হয়। এটি সাধারণত শিশুর জন্ম থেকে শুরু হয় এবং শৈশবকাল পর্যন্ত চলে।

✅ **পরিবার:**

- শিশুর প্রথম সামাজিকীকরণ ঘটে তার পরিবারের মাধ্যমে।
- বাবা-মা, ভাইবোন, এবং অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ শেখা শুরু হয়।
- শিশু কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে খেতে হয়, কীভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, তা পরিবারের কাছ থেকেই শেখে।

✅ **ভাষা শিক্ষা ও মৌলিক আচরণ:**

- শিশুরা এই সময়ে তাদের মাতৃভাষা শেখে এবং মৌলিক সামাজিক দক্ষতা যেমন—ভদ্রতা, শিষ্টাচার, এবং সংযম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
- এটি শিশুর আত্মপরিচয় গঠনের মূল ভিত্তি স্থাপন করে।

২. মাধ্যমিক সামাজিকীকরণ (Secondary Socialization)

এই পর্যায়টি তখন শুরু হয় যখন শিশু পরিবার ছেড়ে সমাজের অন্যান্য অংশের সংস্পর্শে আসে, যেমন বিদ্যালয়, বন্ধু-বান্ধব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম।

✅ **বিদ্যালয়:**

- শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বিদ্যালয় শিশুদের নিয়ম-কানুন, দায়িত্ববোধ, ও নেতৃত্ব গুণ শেখায়।
- শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক দক্ষতা বিকশিত হয়।

✅ **বন্ধু ও সহপাঠী:**

- শিশুর সামাজিক বিকাশে বন্ধু ও সহপাঠীদের ভূমিকা অপরিসীম।
- এখানে শিশু দলগতভাবে কাজ করা, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, ও সহমর্মিতা শেখে।

✅ **গণমাধ্যম:**

- টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, এবং অন্যান্য গণমাধ্যম শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
- শিশুরা কার্টুন, সিনেমা, সংবাদ, ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিখে।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিকীকরণ (Adult Socialization)

এটি জীবনের এমন একটি পর্যায় যেখানে ব্যক্তি নতুন সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন কর্মজীবন, বিবাহ, এবং নতুন সামাজিক দায়িত্ব।

✅ **কর্মজীবন:**

- কর্মক্ষেত্রে মানুষ নতুন নিয়ম, আচরণ ও পেশাদারিত্ব শেখে।
- এখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ ঘটে।

✅ **বিবাহ ও পারিবারিক জীবন:**

- একজন ব্যক্তি বিবাহের মাধ্যমে নতুন সামাজিক পরিচিতি লাভ করে এবং নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে।

✅ **ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান:**

- ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে।

৩.৫ শিশুর সামাজিকীকরণের গুরুত্ব (Importance of Socialization in Children)

শিশুর সামাজিকীকরণ শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি তার ব্যক্তিত্ব, জীবনযাত্রা, এবং সমাজের সাথে সংযুক্তির জন্য অপরিহার্য। নিচে সামাজিকীকরণের গুরুত্বের প্রধান দিকগুলো আলোচনা করা হলো—

১. ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক (Helps in Personality Development)

- সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস বিকশিত হয়।
- এটি শিশুর আচরণ, চিন্তাভাবনা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গঠনে সহায়তা করে।

২. ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ করে (Develops Language and Communication Skills)

- সামাজিকীকরণ শিশুকে ভাষা শেখায়, যা যোগাযোগ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য।
- ভাষার মাধ্যমে শিশু অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

৩. সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে (Enhances Social Skills)

- শিশুরা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখে, যা তার সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- এটি দলগতভাবে কাজ করা, সহযোগিতা, এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৪. মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটায় (Instills Moral and Ethical Values)

- সামাজিকীকরণ শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শেখায়।
- এটি সততা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, ও নৈতিকতা গঠনে সহায়ক।

৫. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা শেখায় (Teaches Self-Control and Discipline)

- শিশুরা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নিয়ম মেনে চলা, ধৈর্যধারণ, ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখে।
- এটি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে।

৬. সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপন করে (Connects the Individual with Society)

- সামাজিকীকরণ শিশুকে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে।
- এটি সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে তাকে প্রস্তুত করে।

৭. শিক্ষার গুরুত্ব বোঝায় (Emphasizes the Importance of Education)

- শিশুরা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।
- এটি তাদের বিদ্যালয়ের নিয়ম, শেখার পদ্ধতি এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে।

৮. নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে (Develops Leadership and Responsibility)

- সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুরা নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করে।
- এটি তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

সামাজিকীকরণ শিশুর ব্যক্তিত্ব, আচরণ, এবং সমাজে তার ভূমিকা গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধু, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু সামাজিক, নৈতিক ও মানসিকভাবে পরিপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। একটি সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শিশুর ভবিষ্যৎকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৩.৬ সামাজিক বিকাশের নীতি: এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Principles of Social Development: Theory of Psycho-social development of Erikson)

মানব বিকাশ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং পারিপার্শ্বিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী **এরিক এইচ. এরিকসন (Erik H. Erikson)** তাঁর **মনোসামাজিক বিকাশের তত্ত্ব (Psychosocial Development Theory)** প্রস্তাব করেন, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের আটটি প্রধান ধাপ বর্ণনা করে। এরিকসনের মতে, মানবজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কিছু নির্দিষ্ট মনোসামাজিক সংকট (psychosocial crisis) বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, যা যদি ইতিবাচকভাবে সমাধান করা যায়, তবে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। অন্যথায়, ব্যক্তি মানসিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের আটটি ধাপ (Stages of Psycho-social development of Erikson

১. বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস (Trust vs. Mistrust) [শৈশবকাল: ০-১.৫ বছর]

- এই পর্যায়ে শিশুর প্রধান চাহিদা হলো নিরাপত্তা এবং স্নেহ।
- যদি বাবা-মা বা অভিভাবকরা শিশুর প্রতি যত্নশীল হন, তার চাহিদা পূরণ করেন, এবং ভালোবাসা দেন, তবে শিশুর মধ্যে এক বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, পৃথিবী একটি নিরাপদ স্থান।
- কিন্তু যদি শিশুর প্রতি অবহেলা করা হয় বা সে বারবার নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, তবে তার মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন হতে পারে।
- ইতিবাচক ফলাফল: শিশুর আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়।
- নেতিবাচক ফলাফল: ভবিষ্যতে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অনাস্থার মনোভাব গড়ে ওঠে।

২. স্বায়ত্তশাসন বনাম লজ্জা ও সন্দেহ (Autonomy vs. Shame and Doubt) [শৈশবকাল: ১.৫-৩ বছর]

- এই পর্যায়ে শিশুর মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রবণতা দেখা যায়।
- শিশুরা যখন নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- কিন্তু যদি বাবা-মা তাদের সবকিছুতে বাধা দেন বা অতিরিক্ত শাসন করেন, তবে তাদের মধ্যে লজ্জা ও সন্দেহ তৈরি হতে পারে।

- ইতিবাচক ফলাফল: শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- নেতিবাচক ফলাফল: সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ততা, হীনমন্যতা ও আত্মসন্দেহ সৃষ্টি হয়।

৩. উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt) [প্রাক-বিদ্যালয়কাল: ৩-৬ বছর]

- শিশুরা এই পর্যায়ে বিভিন্ন নতুন কাজ করার চেষ্টা করে এবং নিজেদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।
- যদি বাবা-মা তাদের কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করেন, তবে তারা উদ্যোগী হয়ে ওঠে।
- কিন্তু যদি শিশুর প্রশ্ন বা কর্মকাণ্ডকে বাধা দেওয়া হয় বা দমন করা হয়, তবে তাদের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়।
- ইতিবাচক ফলাফল: সৃজনশীলতা, আত্মপ্রত্যয় ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটে।
- নেতিবাচক ফলাফল: শিশু অনুপ্রেরণাহীন হয়ে পড়ে এবং নতুন কিছু করার ক্ষেত্রে সংকোচ বোধ করে।

৪. কর্মোদ্যম বনাম নিকৃষ্টতা (Industry vs. Inferiority) [বিদ্যালয়কাল: ৬-১২ বছর]

- বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশুরা সমাজের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয় এবং বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করে।
- তারা যখন নিজেদের পরিশ্রম ও চেষ্টার মাধ্যমে সফল হয়, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- কিন্তু যদি তারা ক্রমাগত ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় বা পরিবার ও শিক্ষকদের কাছ থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পায়, তবে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি হয়।
- ইতিবাচক ফলাফল: শিশুর পরিশ্রমী মনোভাব, সাফল্যের অনুভূতি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- নেতিবাচক ফলাফল: শিশুর আত্মবিশ্বাস কমে যায়, সে নিজেকে অন্যদের তুলনায় কম যোগ্য মনে করে।

৫. আত্মপরিচয় বনাম পরিচয় বিভ্রান্তি (Identity vs. Role Confusion) [কৈশোরকাল: ১২-১৮ বছর]

- এই সময়ে কিশোর-কিশোরীরা নিজের পরিচয় ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে।
- যদি তারা নিজেদের সঠিক পরিচয় খুঁজে পায় এবং সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে আত্মপরিচয়ের বিকাশ ঘটে।
- কিন্তু যদি তারা বিভ্রান্তিতে থাকে বা তাদের লক্ষ্য অনিশ্চিত হয়, তবে পরিচয় বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
- ইতিবাচক ফলাফল: আত্মপরিচয় গঠিত হয়, কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে।
- নেতিবাচক ফলাফল: পরিচয় বিভ্রান্তি, দিশাহীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে।

৬. অন্তরঙ্গতা বনাম একাকীত্ব (Intimacy vs. Isolation) [যৌবনকাল: ১৮-৪০ বছর]

- এই পর্যায়ে ব্যক্তিরা গভীর সম্পর্ক ও সামাজিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে।
- যদি তারা সফলভাবে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তবে তাদের মধ্যে মানসিক স্থিতিশীলতা আসে।

- কিন্তু যদি তারা সম্পর্ক গড়তে ব্যর্থ হয় বা একাকী থেকে যায়, তবে একাকীত্ব ও বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে।
- ইতিবাচক ফলাফল: সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- নেতিবাচক ফলাফল: একাকীত্ব, হতাশা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

৭. উৎপাদনশীলতা বনাম স্থবিরতা (Generativity vs. Stagnation) [প্রাপ্তবয়স্ক জীবন: ৪০-৬৫ বছর]

- এই সময়ে ব্যক্তিরা সমাজে অবদান রাখার চেষ্টা করে, পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণে কাজ করে এবং নিজেকে উপযোগী প্রমাণ করতে চায়।
- যদি তারা সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত থাকে, তবে তারা সমাজে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে।
- কিন্তু যদি তারা জীবনে স্থবিরতা অনুভব করে, তবে তারা অসন্তুষ্ট ও হতাশ হয়ে পড়ে।
- ইতিবাচক ফলাফল: সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।
- নেতিবাচক ফলাফল: ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং জীবনে কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।

৮. আত্মবিশ্বাস বনাম হতাশা (Integrity vs. Despair) [বার্ধক্য: ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব]

- এই পর্যায়ে ব্যক্তি তার জীবনের দিকে ফিরে তাকায় এবং নিজের অর্জন মূল্যায়ন করে।
- যদি সে তার জীবনকে অর্থবহ ও সন্তোষজনক মনে করে, তবে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।
- কিন্তু যদি সে মনে করে যে তার জীবন ব্যর্থ হয়েছে, তবে হতাশা ও দুঃখবোধে আক্রান্ত হয়।
- ইতিবাচক ফলাফল: জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
- নেতিবাচক ফলাফল: হতাশা, মৃত্যুভয় ও অতীত নিয়ে অনুশোচনা দেখা দেয়।

এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের তত্ত্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিটি স্তরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। প্রতিটি পর্যায়ে ব্যক্তি একটি সংকটের মুখোমুখি হয়, যা তার ভবিষ্যৎ আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিবেশ পেলে ব্যক্তি ইতিবাচকভাবে বিকশিত হতে পারে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

৩.৭ সারাংশ (Summary)

এই অধ্যায়ে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি শিশু সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ, আচরণ এবং ভাষা শিখে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটি পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধুবান্ধব, গণমাধ্যম, এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে চলে এবং জীবনের সকল পর্যায়ে এটি ঘটে। এর মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্ব, ভাষা দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্ব অনুযায়ী, মানব জীবনের প্রতিটি ধাপে কিছু মনোসামাজিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়, যার সমাধান ব্যক্তি উন্নতি বা অবনতির দিকে নিয়ে যায়। এই তত্ত্বে আটটি

প্রধান ধাপ রয়েছে, যেমন শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত বিভিন্ন মানসিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। সামাজিকীকরণ শিশুকে শুধু সামাজিক আচরণ শেখায় না, বরং তাকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে।

৮.৩ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (self-evaluation Questions)

1. আপনি কীভাবে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পেলেন এবং এর গুরুত্ব কীভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন?
2. এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশ তত্ত্বের কোন ধাপটি আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং কেন?
3. শিশুর সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় পরিবারের ভূমিকা কীভাবে ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব ফেলে বলে আপনি মনে করেন?
4. সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর ভাষা এবং যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ কিভাবে ঘটে, তা ব্যাখ্যা করুন।
5. সামাজিকীকরণের বিভিন্ন স্তর (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, প্রাপ্তবয়স্ক) শিশুদের সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশে কীভাবে সাহায্য করে?

৩.৯ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Erikson, E. H. (১৯৬৩). *Childhood and Society.* Norton & Company.
- Santrock, J. W. (২০২১). *Life-Span Development.* McGraw Hill.
- Berk, L. E. (২০২০). *Development Through the Lifespan.* Pearson.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- রাষ্ট্রপুঞ্জ শিশু অধিকার সনদ (United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC)

ব্লক-২ শিশু-কেন্দ্রিক প্রগতিশীল শিক্ষা (Child-centric Progressive Education))

একক: ৪ গঠন এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ এর উন্নয়ন: পিঁয়াজে, কোহলবার্গ, এবং ভাইগটস্কি (Construction and Development of Critical Perspective: Piaget, Kohlberg, Vygotsky)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

- শিশু-কেন্দ্রিক প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জাঁ পিঁয়াজে, লরেন্স কোহলবার্গ এবং লেভ ভাইগটস্কির তত্ত্বগুলোর মূল দিকগুলো অনুধাবন করতে পারবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বুঝতে পারবে।

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা কেবল তথ্য স্থানান্তরের মাধ্যম নয়; এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিশুর মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা, অনুসন্ধানী মনোভাব ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তিকে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নির্দেশনামূলক হলেও, শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার বিকাশকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো শেখার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যেখানে শিশুদের চিন্তাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে ওঠে। এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাঁ পিঁয়াজে জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব (Cognitive Development Theory), লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Moral Development Theory) এবং লেভ ভাইগটস্কির সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব (Sociocultural Theory) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি গঠনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বগুলোর আলোকে শিক্ষার গঠন, শিশুদের শেখার পদ্ধতি ও শিক্ষার সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণ করা হবে।

৪.৩ গঠন এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ এর উন্নয়ন: পিঁয়াজে, কোহলবার্গ, এবং ভাইগটস্কি

৪.৩.১ জাঁ পিঁয়াজে জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব (Jean Piaget's Cognitive Development Theory)

জাঁ পিঁয়াজে বিশ্বাস করতেন যে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া, যা চারটি প্রধান স্তরে বিভক্ত:

1. **সংবেদন সঞ্চালন মূলক স্তর/ Sensorimotor Stage (০-২ বছর)**
    - শিশু ইন্দ্রিয় ও নড়াচড়ার মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝতে শেখে।
    - বস্তু স্থায়িত্ব (Object Permanence) ধারণার বিকাশ ঘটে।
2. **প্রাক সক্রিয়তা স্তর/ Preoperational Stage (২-৭ বছর)**
    - প্রতীকী চিন্তা (Symbolic Thought) গড়ে ওঠে।
    - শিশুরা স্বকেন্দ্রিক (Egocentric) থাকে, অর্থাৎ তারা অন্যের দৃষ্টিকোণ বুঝতে অক্ষম।
3. **সক্রিয়তার স্তর/ Concrete Operational Stage (৭-১১ বছর)**

- যৌক্তিক চিন্তাভাবনা এবং সংরক্ষণ (Conservation) ধারণার বিকাশ ঘটে।
- শিশু বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হয়।

4. **যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর/ Formal Operational Stage (১১-১৬ বছর)**
    - বিমূর্ত চিন্তাভাবনা ও অনুমান নির্ভর যুক্তি বিকশিত হয়।
    - শিশুরা সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে শেখে।

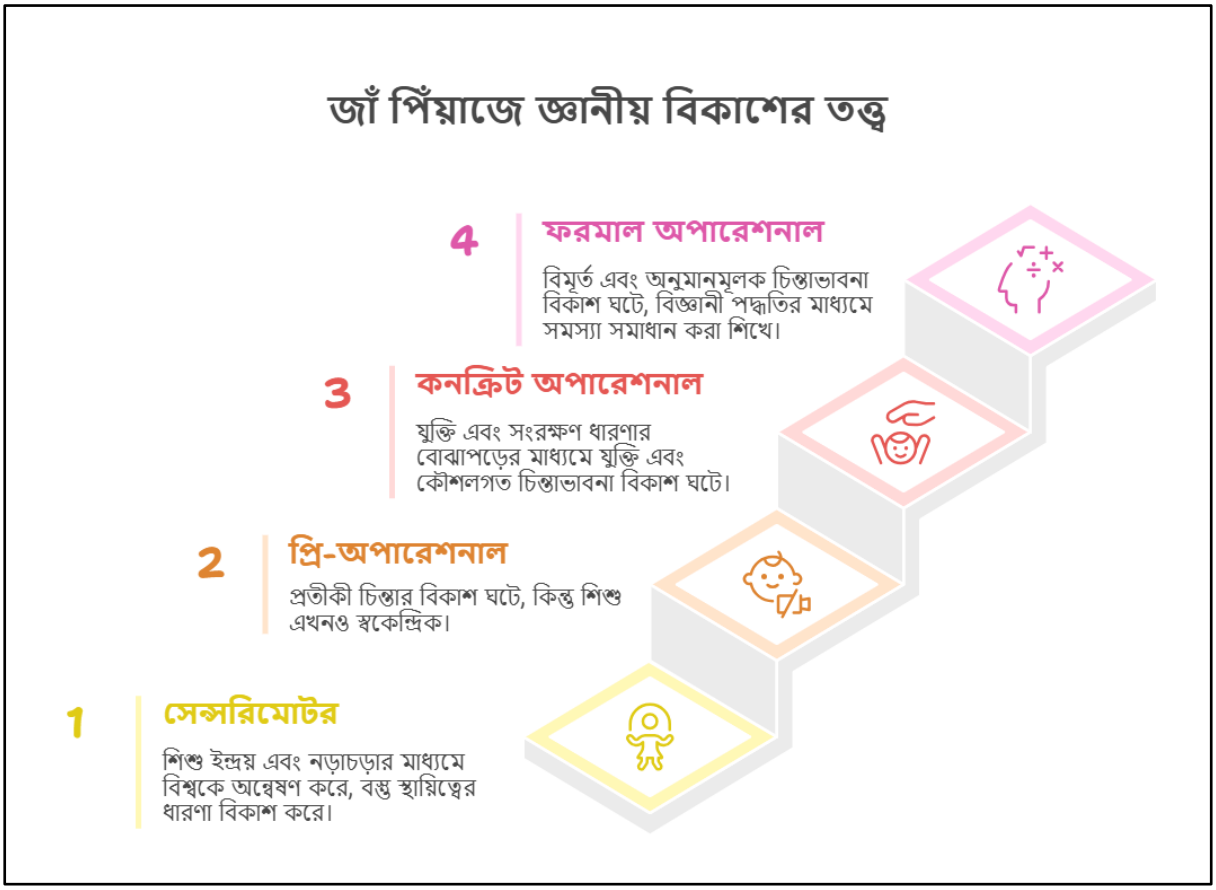

চিত্র: জাঁ পিঁয়াজে জ্ঞানীয় বিকাশের তত্ত্ব

সমালোচনা:

- পিঁয়াজে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশকে পর্যায়ক্রমিক বলেছেন, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে বিকাশ প্রায়শই অবিচ্ছিন্ন হয়।
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

৪.৩.২ লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব (Lawrence Kohlberg's Moral Development Theory)

কোহলবার্গ পিঁয়াজে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নৈতিক উন্নয়নকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন:

1. **প্রাক প্রথাগত স্তর/ Pre-conventional Morality [শৈশবকাল]**
    - শাস্তি ও পুরস্কার দ্বারা নৈতিকতা নির্ধারিত হয়।

- শিশুরা স্বার্থপরতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

2. **প্রথাগত স্তর /Conventional Morality [কৈশোর ও যৌবন]**
    - সামাজিক নিয়ম, আইন ও কর্তৃত্বকে মান্য করা হয়।
    - শিশুরা গোষ্ঠী ও সমাজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে।
3. **উত্তর প্রথাগত স্তর/ Post-conventional Morality [প্রাপ্তবয়স্কদের পর্যায়]**
    - নৈতিক নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
    - ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের বিষয় গুরুত্ব পায়।

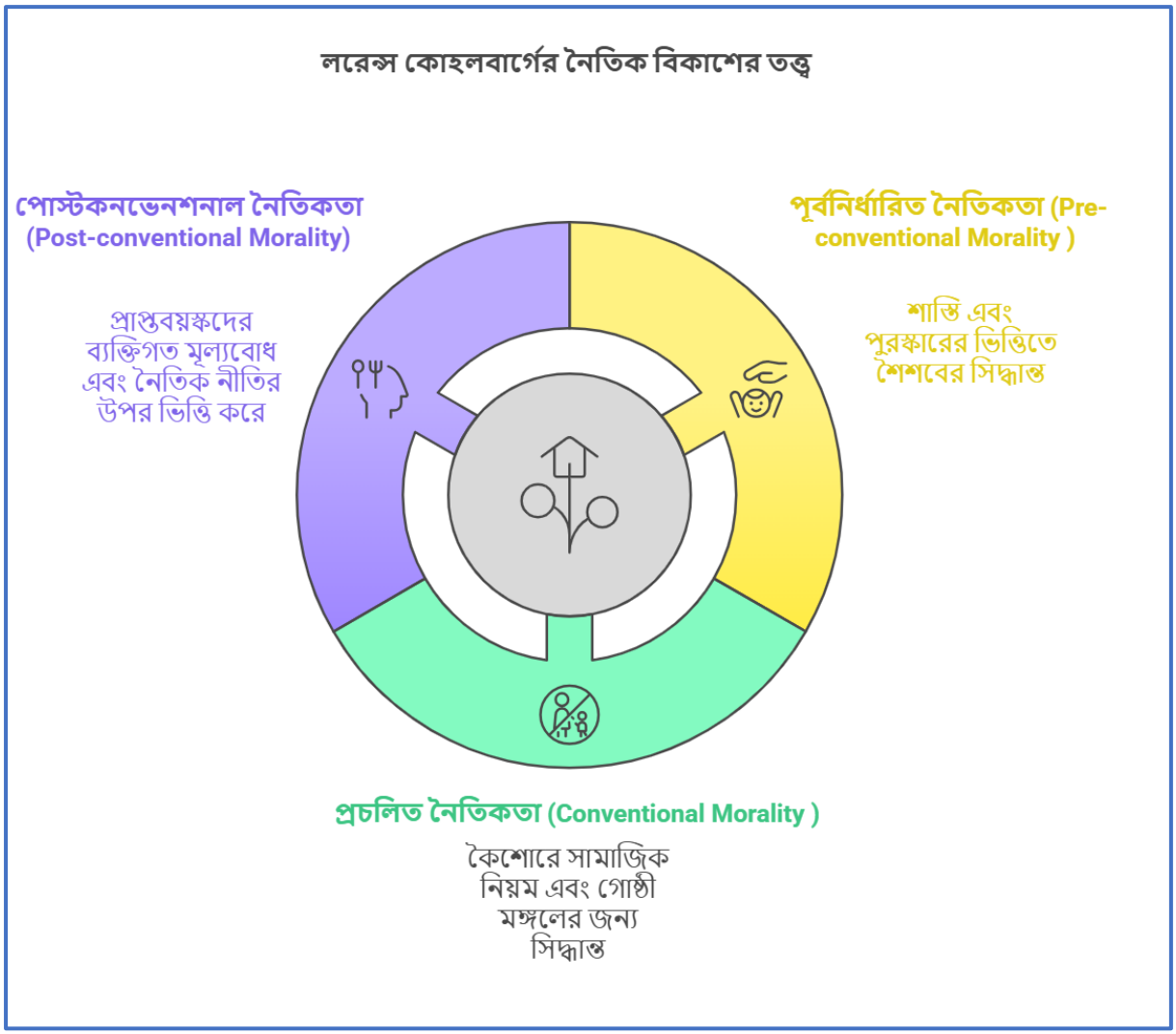

চিত্র: লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব

সমালোচনা (Criticism)

- গবেষণায় দেখা গেছে, সব মানুষ কোহলবার্গের সর্বোচ্চ নৈতিক স্তরে পৌঁছায় না।
- এটি পশ্চিমা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা সর্বজনীন নয়।

৪.৩.৩ লেভ ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের তত্ত্ব (Vygotsky's Sociocultural Theory of Development)

লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky) একজন প্রভাবশালী মনোবিজ্ঞানী, যিনি বিশ্বাস করতেন যে শিশুর বিকাশ মূলত **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার (Social and Cultural Interaction)** মাধ্যমে ঘটে। তিনি পিয়াজের মতো শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে শেখার ধারণার পরিবর্তে জোর দেন সামাজিক প্রভাব ও পারিপার্শ্বিকতার ভূমিকার উপর।

ভাইগটস্কির মতে, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক বিকাশ সরাসরি সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়। তাঁর তত্ত্বের মূল ভিত্তিগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. নিকটবর্তী বিকাশের অঞ্চল (Zone of Proximal Development - ZPD)

ভাইগটস্কি বলেন, শিশুরা দুটি স্তরে শেখে:

- **বর্তমান সক্ষমতা (Actual Development Level):** যা শিশুরা স্বাধীনভাবে করতে পারে।
- **সম্ভাব্য সক্ষমতা (Potential Development Level):** যা তারা দক্ষ ব্যক্তি বা শিক্ষকের সহায়তায় করতে পারে।

👉 **ZPD হলো এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী অংশ**, যেখানে শিশু সহায়তা পেলে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

২. স্ক্যাফোল্ডিং (Scaffolding) বা সহায়ক শেখানো

- শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিশুকে প্রথমে সহযোগিতা করে, পরে ধাপে ধাপে সাহায্য কমিয়ে দেয়।
- উদাহরণ: একজন শিক্ষক শিশুকে অংকের একটি নতুন কৌশল শেখানোর সময় প্রথমে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করেন, পরে ধীরে ধীরে শিশুকে স্বাধীনভাবে সমাধান করতে উৎসাহিত করেন।

৩. ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক

- ভাষাকে তিনি শেখার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন।
- শিশুর নিজের সাথে কথা বলা তাকে সমস্যার সমাধান ও শেখার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- ভাষা এবং চিন্তার বিকাশ একসঙ্গে ঘটে এবং সমাজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

৪. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও শেখা

- শিশুর শেখার প্রধান উৎস হল সামাজিক পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা।
- পরিবার, শিক্ষক ও সমবয়সীদের সঙ্গে যোগাযোগ শিশুদের দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

👉 **ভাইগটস্কির মতে, শেখার জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং প্রাপ্তবয়স্ক বা দক্ষ ব্যক্তির সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।**

ভাইগটস্কির শিশু বিকাশের পর্যায়সমূহ (Stages of Child Development According to Vygotsky)

ভাইগটস্কি শিশুর বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন, যেখানে ভাষা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং শেখার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, শিশুর বিকাশে তিনটি প্রধান পর্যায় রয়েছে:

১. প্রাক-বৌদ্ধিক পর্যায় (Primitive Stage) [জন্ম থেকে ২ বছর]

- শিশু এই পর্যায়ে মূলত **জৈবিক প্রবৃত্তির (Biological Instincts)** উপর নির্ভরশীল।
- ভাষার বিকাশ শুরু হয়, কিন্তু এটি চিন্তার সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত হয় না।
- শিশু অনুকরণ (Imitation) এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেখে।

২. আদিম বা স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার পর্যায় (Naïve Psychology Stage) [২-৭ বছর]

- শিশুরা ভাষা শেখে, কিন্তু তাদের চিন্তা ও ভাষা এখনও পুরোপুরি সংযুক্ত হয়নি।
- এই পর্যায়ে শিশুরা বিভিন্ন বস্তু এবং তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
- শিশুরা তাদের আশেপাশের মানুষদের আচরণ অনুকরণ করতে শুরু করে।

৩. আত্মকেন্দ্রিক বক্তৃতা ও অভ্যন্তরীণ চিন্তার পর্যায় (Egocentric Speech & Inner Thought Stage) [৭+ বছর]

- শিশুরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের সাথে কথা বলে (**Private Speech**)।
- ধীরে ধীরে, এই স্বকথন অভ্যন্তরীণ চিন্তায় পরিণত হয়, যা পরবর্তী জ্ঞানীয় বিকাশে সহায়তা করে।
- ভাষা ও চিন্তার মধ্যে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি হয়, যা শিশুর শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

☞ ভাইগটস্কির মতে, ভাষা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ ঘটে, এবং এটি পরিবেশ ও সমাজের উপর নির্ভরশীল।

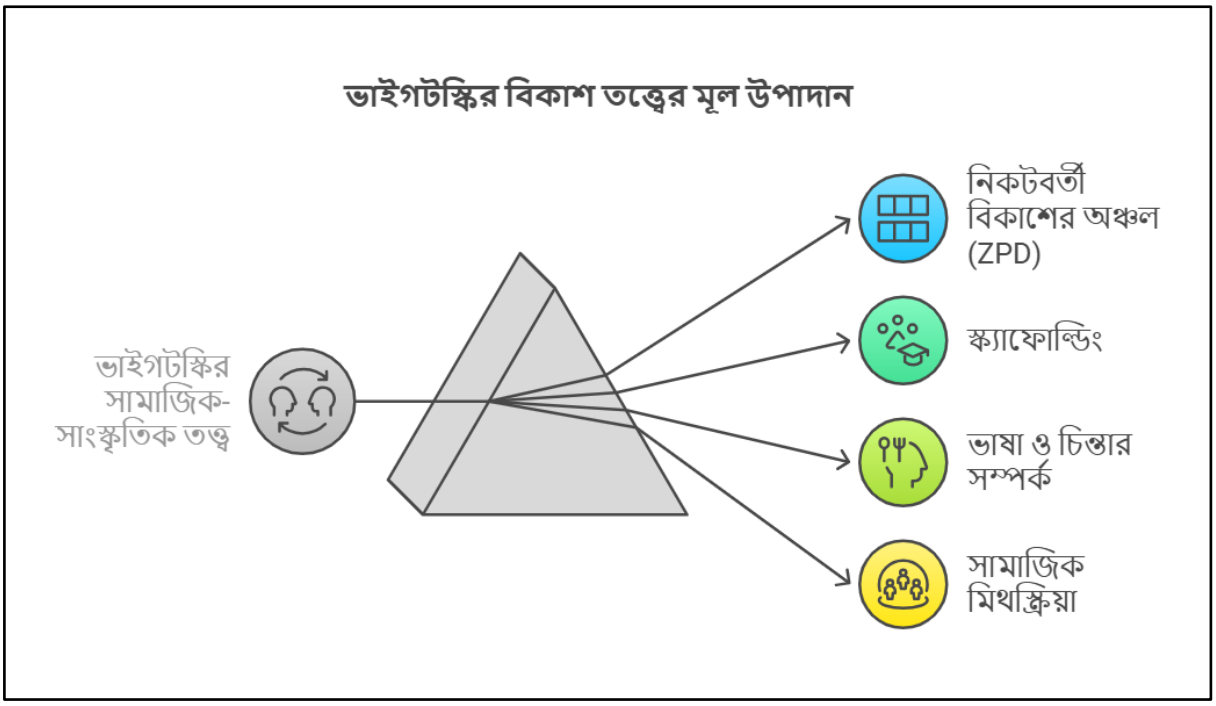

চিত্র: লেভ ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের তত্ত্ব

ভাইগটস্কির তত্ত্বের মূল বিষয় হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং ভাষার ভূমিকা শিশুর শিক্ষাগত ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিকটবর্তী বিকাশের অঞ্চল (ZPD) ধারণা শিক্ষকদের শেখানোর পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়তা করে, যেখানে শিশুর স্বাভাবিক দক্ষতার বাইরে তাকে সাহায্য করা হয়। এছাড়াও, ভাষার বিকাশ এবং সামাজিক পরিবেশ কিভাবে শিশুর শেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

👉 এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে "সহায়ক শিক্ষণ (Scaffolding)", "সক্রিয় শেখা (Active Learning)" এবং "সহযোগিতামূলক শিক্ষণ (Collaborative Learning)" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সমালোচনা:

- ভাইগটস্কি শেখার ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে গুরুত্ব দিলেও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জিনগত প্রভাবের ভূমিকা নিয়ে কম আলোচনা করেছেন।

8.8 সারাংশ (Summary)

শিক্ষা কেবল তথ্য স্থানান্তরের একটি মাধ্যম নয়; এটি শিশুর মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা, অনুসন্ধানী মনোভাব ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তিকে উৎসাহিত করে। এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন, যেমন জাঁ পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব, লরেন্স কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব এবং লেভ ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব ।পিঁয়াজে জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব শিশুর শেখার প্রাকৃতিক ধাপ নির্ধারণ করে, যেখানে তারা পর্যায়ক্রমে সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্ত চিন্তার দিকে অগ্রসর হয় ।কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের

তিনটি স্তর ব্যাখ্যা করে, যা শাস্তি-পুরস্কার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত থেকে নীতিগত মূল্যবোধের দিকে অগ্রসর হয়।ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব শেখার ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, ভাষার ভূমিকা ও নিকটবর্তী বিকাশের অঞ্চলের (ZPD) গুরুত্ব তুলে ধরে। এই তিনটি তত্ত্ব শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলো শিক্ষকদের শেখানোর কৌশল উন্নত করতে ও শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করতে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। পিঁয়াজে, কোহলবার্গ এবং ভাইগটস্কির তত্ত্ব শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পিঁয়াজে, শেখার মানসিক গঠন, কোহলবার্গ নৈতিক চিন্তার বিকাশ এবং ভাইগটস্কি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। প্রগতিশীল শিক্ষায় এই তত্ত্বগুলোর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, কারণ এগুলো শিক্ষকদেরকে শেখানোর পদ্ধতি উন্নত করতে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে সহায়তা করতে দিকনির্দেশনা দেয়।

4.5 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. পিঁয়াজে জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্ব কতটি পর্যায়ে বিভক্ত? প্রতিটি পর্যায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২. কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের প্রধান স্তরগুলো কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের তত্ত্বের মূল ধারণাগুলো কী? জোন অব প্রোক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট (ZPD) কীভাবে শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?

৪. শিশু শিক্ষায় সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব কী? পিঁয়াজে ও ভাইগটস্কির তত্ত্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

৫. শিশু-কেন্দ্রিক প্রগতিশীল শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী?ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বে ভাষার কী ভূমিকা রয়েছে?

৪.৬ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Piaget, J. (১৯৫২). *The Origins of Intelligence in Children.* Norton.

  Kohlberg, L. (১৯৮১). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice.* Harper & Row.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- Piaget, J. (১৯৫২). *The Origins of Intelligence in Children.* New York: Norton.
- Kohlberg, L. (১৯৮৪). *Essays on Moral Development, Vol. ২: The Psychology of Moral Development.* Harper & Row.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
- Piaget, J. (১৯৭০). *Science of Education and the Psychology of the Child.* Penguin Books.

- Kohlberg, L. (১৯৬৯). "Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization." In D. A. Goslin (Ed.), *Handbook of Socialization Theory and Research* (pp. ৩৪৭–৪৮০). Rand McNally.
- Vygotsky, L. S. (১৯৩৪/১৯৮৬). *Thought and Language.* MIT Press.

একক: ৫ শিশু-কেন্দ্রিক এবং প্রগতিশীল শিক্ষা (Child Centered and Progressive Education)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটির অধ্যায়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:-

- শিশুদেরকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শেখার সুযোগ দেওয়া।
- শিশুদের সমস্যা সমাধান ও নতুন বিষয় শেখার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- শিশুদের মধ্যে দলগত কাজ, সহমর্মিতা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার দক্ষতা গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো।
- শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

৫.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা শুধু তথ্য আহরণের প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি শিশুদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিগত বিকাশের একটি মাধ্যম। শিশু-কেন্দ্রিক এবং প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র চাহিদা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে। এই শিক্ষাদর্শন মূলত শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, অনুসন্ধানমূলক চিন্তা ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার ওপর জোর দেয়। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূলনীতি হলো, প্রতিটি শিশু আলাদা এবং তাদের শেখার ধরণ, গতি ও ক্ষমতা একে অপরের থেকে ভিন্ন হতে পারে। ফলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের ভূমিকা হয় সহায়ক ও পথপ্রদর্শকের, যারা শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করেন। অন্যদিকে, প্রগতিশীল শিক্ষা দর্শনটি সমাজ, বিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলে। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে শিশুরা নিজেরাই শেখার বিষয়বস্তু আবিষ্কার করতে পারে। তাই, শিশু-কেন্দ্রিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা শুধু একাডেমিক দক্ষতা নয়, বরং শিশুদের স্বাধীন চিন্তা, সমস্যার সমাধান এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫.৩ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণা (Concept of Child-Centered Education)

শিশু-কেন্দ্রিক এবং প্রগতিশীল শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাগত দর্শন, যেখানে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্যাসিভ শ্রোতা নয়, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে শেখে। শিক্ষকের ভূমিকা এখানে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানকারী নয়, বরং একজন গাইড বা সহায়ক হিসেবে কাজ করা। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা হল একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি, যেখানে প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্রতা, শেখার ধারা এবং গতি অনুযায়ী পাঠদান করা হয়। এই শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি হলো শিশুর আগ্রহ, চাহিদা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শেখার পরিবেশ গঠন করা।

☞ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল দিক:

- শেখার কেন্দ্রে থাকে শিশু, শিক্ষক নয়।
- পাঠদান পদ্ধতি হয় নমনীয় এবং কৌতূহলভিত্তিক।
- শিশুদের চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- খেলাধুলা, গল্প, প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখানো হয়।
- শিশুর সামাজিক, আবেগিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সমানভাবে গুরুত্ব পায়।
- শেখার পরিবেশ হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং ইতিবাচক, যাতে শিশুরা নিজেদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারে।

☞ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তুলতে অবদান রেখেছেন:

- জঁ জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau)
- জন ডিউই (John Dewey)
- মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori)
- লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky)
- জাঁ পিঁয়াজে (Jean Piaget)

☞ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব:

- এটি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
- সমস্যা সমাধান এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- শিক্ষার চাপ কমিয়ে শেখার আনন্দ তৈরি করে।
- বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করে।

☞ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Child-Centered Education)

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্রতা (Individuality of the Child)

- প্রতিটি শিশু আলাদা এবং তার শেখার ধরণ ও গতি আলাদা।
- শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনা করা হয়।

২. শেখার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া (Emphasis on Natural Curiosity)

- শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা শেখার প্রধান চালিকা শক্তি।
- শেখার পরিবেশ হতে হবে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধকারী ও অন্বেষণমূলক।

৩. বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কার্যকরী শিক্ষা (Learning by Doing)

- শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে।
- প্রকল্পভিত্তিক, গবেষণাধর্মী ও সমস্যা-সমাধানমূলক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়।

৪. খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা (Play-Based Learning)

- শিশুর বিকাশে খেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশুদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে খেলাধুলাকে শিক্ষার অংশ করা হয়।

৫. সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব (Emphasis on Social and Emotional Development)

- শিশুদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দক্ষতা শেখানো হয়।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য পাঠদান করা হয়।

৬. শিক্ষকের সহায়ক ভূমিকা (Teacher as a Facilitator)

- শিক্ষক শিশুদের শেখার পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেন।
- তিনি শিশুদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেন।

৭. মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নমনীয়তা (Flexible Assessment Methods)

- শুধু পরীক্ষা নির্ভর মূল্যায়ন নয়, বরং পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে শিশুর শেখা মূল্যায়ন করা হয়।
- শিশুর অগ্রগতি তার স্বতন্ত্র বিকাশের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়।

☞ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা (Challenges of Child-Centered Education)

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা একটি উদ্ভাবনী ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা হলেও এর বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রীর অভাব, শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ঘাটতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির জটিলতা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে। নিচে এই সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. উচ্চ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (High Student-Teacher Ratio)

- শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত শিশুদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
- কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হওয়ায় শিক্ষকের পক্ষে প্রতিটি শিশুর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।
- ফলস্বরূপ, শিশুর স্বতন্ত্র বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়।

২. শিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of Teacher Training)

- শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- অনেক শিক্ষক এখনো প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতির সঙ্গে অভ্যস্ত, ফলে তাঁরা শিশুর আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান করতে সক্ষম হন না।
- আধুনিক শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকায় শিক্ষকেরা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হন।

৩. পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রীর অভাব (Lack of Adequate Learning Materials)

- শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকর শিক্ষাসামগ্রী, যেমন—খেলাধুলার সরঞ্জাম, চার্ট, মডেল, গল্পের বই, প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাসামগ্রী প্রয়োজন।
- অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের উপকরণের অভাব রয়েছে, যা কার্যকর শেখার পরিবেশ তৈরি করতে বাধা সৃষ্টি করে।
- ডিজিটাল শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় শিশু-কেন্দ্রিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করা কঠিন হয়।

৪. মূল্যায়ন পদ্ধতির জটিলতা (Complexity of Assessment Methods)

- প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়, যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
- শিশুর সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও বাস্তব দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োজন।
- কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি না থাকায় শিশুর প্রকৃত অগ্রগতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. শিক্ষার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব (Lack of Self-Regulation in Students)

- অনেক শিশুর স্বতন্ত্রভাবে শেখার ক্ষমতা থাকলেও, কিছু শিশু দিকনির্দেশনা ছাড়া সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে না।
- শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে যদি তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারে, তবে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা দিতে পারে।
- শিক্ষকের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সব সময় পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬. অভিভাবকদের অসচেতনতা ও প্রতিরোধ (Parental Unawareness and Resistance)

- অনেক অভিভাবক প্রচলিত পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বেশি কার্যকর মনে করেন এবং শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে খুব শিথিল বলে মনে করেন।
- তারা পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন, যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
- অভিভাবকদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের অভাবের কারণে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৭. সময় ও অর্থের চাহিদা (Time and Cost Constraints)

- শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় বেশি সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়।
- প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করা এবং কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।
- অনেক স্কুলের বাজেট কম হওয়ায় পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৮. পাঠক্রমের অনমনীয়তা (Rigidity of Curriculum)

- অনেক শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্বনির্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল দর্শনের সঙ্গে খাপ খায় না।
- শিশুদের শেখার গতি, কৌতূহল ও আগ্রহ অনুসারে পরিবর্তনশীল শিক্ষাক্রমের সুযোগ সব সময় থাকে না।

৫.৪ প্রগতিশীল শিক্ষা: উৎপত্তি এবং দর্শন (Origin and Philosophy of Progressive Education)

☞ **প্রগতিশীল শিক্ষা** (Progressive Education) হলো এমন একটি শিক্ষাদর্শন, যা শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল, অভিজ্ঞতা, সমস্যা-সমাধানের দক্ষতা এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি ঐতিহ্যবাহী পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে শিশু-কেন্দ্রিক, কার্যকলাপভিত্তিক ও বাস্তবজীবনমুখী শিক্ষাপদ্ধতিকে সমর্থন করে।

☞ উৎপত্তি (Origin of Progressive Education)

প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণার উৎপত্তি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যখন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কড়াকড়ি ও মুখস্থনির্ভরতার বিপরীতে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

☞ প্রগতিশীল শিক্ষায় অবদানকারী ব্যক্তি:

1. **জঁ জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau) - "Émile" (১৭৬২)**

- রুশো বলেন, শিশুকে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।
- তিনি শিক্ষাকে কৃত্রিম নিয়ম-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অভিজ্ঞতাভিত্তিক করার পক্ষে ছিলেন।

2. **জন ডিউই (John Dewey) - প্রগতিশীল শিক্ষার জনক (Father of Progressive Education)**
    - ডিউই প্রস্তাব করেন যে শিক্ষাকে শুধুমাত্র বইভিত্তিক না রেখে অভিজ্ঞতামূলক (Experiential) করা উচিত।
    - তিনি শিক্ষাকে শিশুর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর জোর দেন।
    - তাঁর বিখ্যাত উক্তি: **"Education is not preparation for life; education is life itself."**

3. **মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori) - শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবক্তা**
    - মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতি শিশুর নিজস্ব শেখার গতি, কৌতূহল ও অন্বেষণমূলক দক্ষতাকে গুরুত্ব দেয়।
    - তিনি শিশুদের স্বাধীনভাবে শেখার পরিবেশ তৈরি করার কথা বলেন।

4. **রুডলফ স্টাইনার (Rudolf Steiner) - ওয়াল্ডর্ফ শিক্ষা পদ্ধতি**
    - শারীরিক, মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশের সমন্বয়ে শিক্ষাকে দেখেছেন।

☞ প্রগতিশীল শিক্ষার দর্শন (Philosophy of Progressive Education)

১. শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Child-Centered Learning)

- শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর আগ্রহ, চাহিদা ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠদান।
- শিশুদের শেখার স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশ ঘটাতে পারে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা (Experiential Learning)

- শিশুরা শুধু বই পড়ে শিখবে না, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করবে।
- প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা এবং বাস্তবজীবনের সমস্যার সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩. গণতান্ত্রিক শিক্ষা (Democratic Education)

- শিক্ষাকে শুধুমাত্র শিক্ষককেন্দ্রিক না রেখে শিক্ষার্থীদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

৪. সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক শিক্ষা (Social Responsibility and Ethical Learning)

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা।
- সমাজসেবামূলক কার্যক্রম, পরিবেশগত সচেতনতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. একাধিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শেখা (Multi-Sensory Learning)

- শিশুর শেখার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত **দৃশ্যমান, শ্রাব্য, স্পর্শযোগ্য, আবেগময় ও ব্যবহারিক**।
- শ্রেণিকক্ষে নাটক, শিল্পকলা, সংগীত, শারীরিক কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করা হয়।

৬. নমনীয় কারিকুলাম (Flexible Curriculum)

- প্রতিটি শিশুর শেখার ধরণ ও গতি ভিন্ন, তাই পাঠ্যক্রম হতে হবে নমনীয়।
- শিশুদের কৌতূহল ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ পরিকল্পনা করা উচিত।

৭. মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন (Modern Assessment Methods)

- প্রচলিত পরীক্ষানির্ভর মূল্যায়নের পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment), প্রকল্প উপস্থাপনা, সহযোগিতামূলক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আত্ম-পর্যালোচনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫.৫ সারাংশ (Summary)

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু তথ্য প্রদান নয়, বরং শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা, কৌতূহল এবং সৃজনশীলতার বিকাশ নিশ্চিত করা। প্রগতিশীল শিক্ষার দর্শন মূলত এটাই বলে যে, শিক্ষা হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া , যেখানে শিশুকে শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য প্রশিক্ষিত না করে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার জন্য এই ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্ ,প্রস্তুত করতে হবে। তবেরে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যেমন—শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব, যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব এবং শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার জটিলতা, যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে সফলভাবে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, শিশু-কেন্দ্রিক প্রগতিশীল শিক্ষা এমন একটি শিক্ষাদর্শন, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রতা, আগ্রহ ও শেখার ধরনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ইউনিটে মূলত শিশু বিকাশের গঠনমূলক তত্ত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। পিয়াজের জ্ঞানীয় বিকাশের তত্ত্ব, কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের ধারা এবং ভাইগটস্কির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের তত্ত্ব শিশুদের শেখার ধরণ, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলো দেখায় যে শিশুদের শেখার প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বিকশিত হয় এবং এটি শুধুমাত্র তাদের বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং সামাজিক পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও পারস্পরিক যোগাযোগের ওপরও নির্ভরশীল।

5.6 স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ বা সমস্যাগুলো কী? সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে?

২. প্রগতিশীল শিক্ষার উৎপত্তি কোথায় এবং এর দর্শন কী? জন ডিওয়ের শিক্ষাদর্শন কীভাবে প্রগতিশীল শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলেছে?

৩. শিক্ষাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শিক্ষা কীভাবে সাহায্য করে?

৪. শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? এটি ঐতিহ্যগত শিক্ষার থেকে কীভাবে আলাদা?

৫. প্রগতিশীল শিক্ষার জনক কে? শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল দিকগুলো আলোচনা করুন।

৫.৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Rousseau, J. J. (১৭৬২). *Émile, or On Education.*
- Dewey, J. (১৯১৬). *Democracy and Education.* New York: Macmillan.
- Montessori, M. (১৯১২). *The Montessori Method.* New York: Frederick A. Stokes Company.
  Dewey, J. (১৯৩৮). *Experience and Education.* Macmillan.
- Slavin, R. E. (২০০৬). *Educational Psychology: Theory and Practice.* Pearson Education.

একক: ৬ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য: ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় এবং ধর্মের বৈচিত্র্য (Individual Difference among learners: Diversity of Language, Caste, Gender, Community and Religion)

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটির অধ্যায়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাষা শেখার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানো।
- শিক্ষার মাধ্যমে বর্ণগত বৈষম্য দূর করে সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পরিচিতি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
- সকল ধর্মের মৌলিক নৈতিক শিক্ষা ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

৬.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা একটি সার্বজনীন অধিকার, তবে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার পরিবেশে প্রবেশ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলো মূলত ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও ধর্মের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই বৈচিত্র্য শুধু তাদের শিখন-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে না, বরং সমাজের বৃহত্তর কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত পার্থক্য তাদের শেখার দক্ষতা ও যোগাযোগের ওপর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে, যা তাদের শিক্ষার ধরন ও সুযোগ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে বা সুযোগের বৈচিত্র্য আনতে পারে। তদ্ব্যতীত, ধর্মীয় পার্থক্য শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরণে ভিন্নতা তৈরি করতে পারে। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ গঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো এই বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তারা সকলেই সমানভাবে শিখতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে। শিক্ষা হল একটি সার্বজনীন অধিকার, যা প্রতিটি শিশুর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে বাস্তবতা হলো, শিক্ষার্থীরা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র—তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক পটভূমি, ভাষাগত দক্ষতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ভিন্ন হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শিক্ষকদের পাঠদান ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় এবং ধর্মের মতো বৈচিত্র্য শিক্ষার পরিবেশকে বহুমাত্রিক করে তোলে এবং এসব পার্থক্যের প্রতি সংবেদনশীলতা তৈরি করাই একজন দক্ষ শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব।

৬.৩ ব্যক্তিগত পার্থক্যের ধারণা (The concept of Individual Difference)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বলতে বোঝায় যে, প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ও শেখার ধরন নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসে। কারও শেখার গতি দ্রুত, কেউ ধীরে শেখে; কেউ সমস্যার সমাধান দ্রুত করতে পারে, আবার কেউ বেশি সময় নেয়; কেউ ভাষাগত দিক থেকে দক্ষ, আবার কেউ নতুন ভাষা শেখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এই পার্থক্য শুধু জ্ঞানীয় নয়, এটি মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিষয়টি মূলত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেখানে প্রতিটি শিশুর আলাদা দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, আবেগীয় প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া বিবেচনা করা হয়। শিশুর এই পার্থক্যগুলো মূলত জন্মগত বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বোঝার জন্য শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন সমান সুযোগ ও সমর্থন পায়, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একটি শ্রেণিকক্ষে যদি একজন শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও ধর্মের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, যা পরবর্তী অংশে ব্যাখ্যা করা হবে।

৬.৪ ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রকারভেদ (Types of Individual Difference)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পায়। এই পার্থক্যসমূহ শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানীয়, আবেগীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক হতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা, শেখার ধরন, পারিবারিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় ভিন্ন হওয়ার কারণে শিক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব এবং অর্জনের মাত্রাও একে অপরের থেকে আলাদা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলোকে বিবেচনায় না নিলে সমান শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব নয়।

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. জ্ঞানমূলক পার্থক্য (Cognitive Differences)

শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা, চিন্তাভাবনার গঠন, স্মৃতিশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা একে অপরের থেকে আলাদা হতে পারে। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরগতিতে শেখে। কেউ বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা করতে পারে, আবার কেউ তথ্য মুখস্থ করে শেখার দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। কিছু শিক্ষার্থী যৌক্তিক ও গাণিতিক দক্ষতায় পারদর্শী, আবার কেউ ভাষাগত দক্ষতার দিক থেকে উন্নত।

২. শারীরিক পার্থক্য (Physical Differences)

সব শিক্ষার্থী শারীরিকভাবে সমান নয়। উচ্চতা, ওজন, স্বাস্থ্যের অবস্থা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণশক্তির সমস্যা, গতিশীলতার সীমাবদ্ধতা বা অন্য কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের এই শারীরিক পার্থক্যগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া জরুরি।

৩. আবেগীয় ও ব্যক্তিত্বগত পার্থক্য (Emotional and Personality Differences)

প্রত্যেক শিশুর আবেগ প্রকাশের ধরন এবং মানসিক গঠনের পার্থক্য থাকে। কেউ খুব আত্মবিশ্বাসী ও স্পষ্টভাষী, আবার কেউ অন্তর্মুখী ও আত্মকেন্দ্রিক। কিছু শিক্ষার্থী সহজেই চাপ সামলাতে পারে, আবার কেউ আবেগের ওঠানামার কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুর আবেগীয় বিকাশ তার পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

৪. ভাষাগত পার্থক্য (Linguistic Differences)

ভাষা শিক্ষার্থীদের শেখার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। যেসব শিক্ষার্থী মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের জন্য শেখার অভিজ্ঞতা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কেউ বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় দক্ষ হতে পারে, আবার কারও জন্য নতুন ভাষা শেখা কঠিন হতে পারে। ভাষাগত পার্থক্য শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর প্রভাব ফেলে।

৫. লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য (Gender Differences)

লিঙ্গ পরিচিতি শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ এবং সমাজের প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে পার্থক্য তৈরি করতে পারে। অনেক দেশে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কম পাওয়া যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে।

৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য (Social and Cultural Differences)

শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্ম, পারিবারিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পরিবারে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়, আবার কোথাও শিশুকে অল্প বয়সে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যা তার শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৭. ধর্মীয় পার্থক্য (Religious Differences)

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে আসে, যা তাদের শিক্ষাজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু শিক্ষার্থী ধর্মীয় মূল্যবোধকে তাদের শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়, আবার কেউ ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে নির্দিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

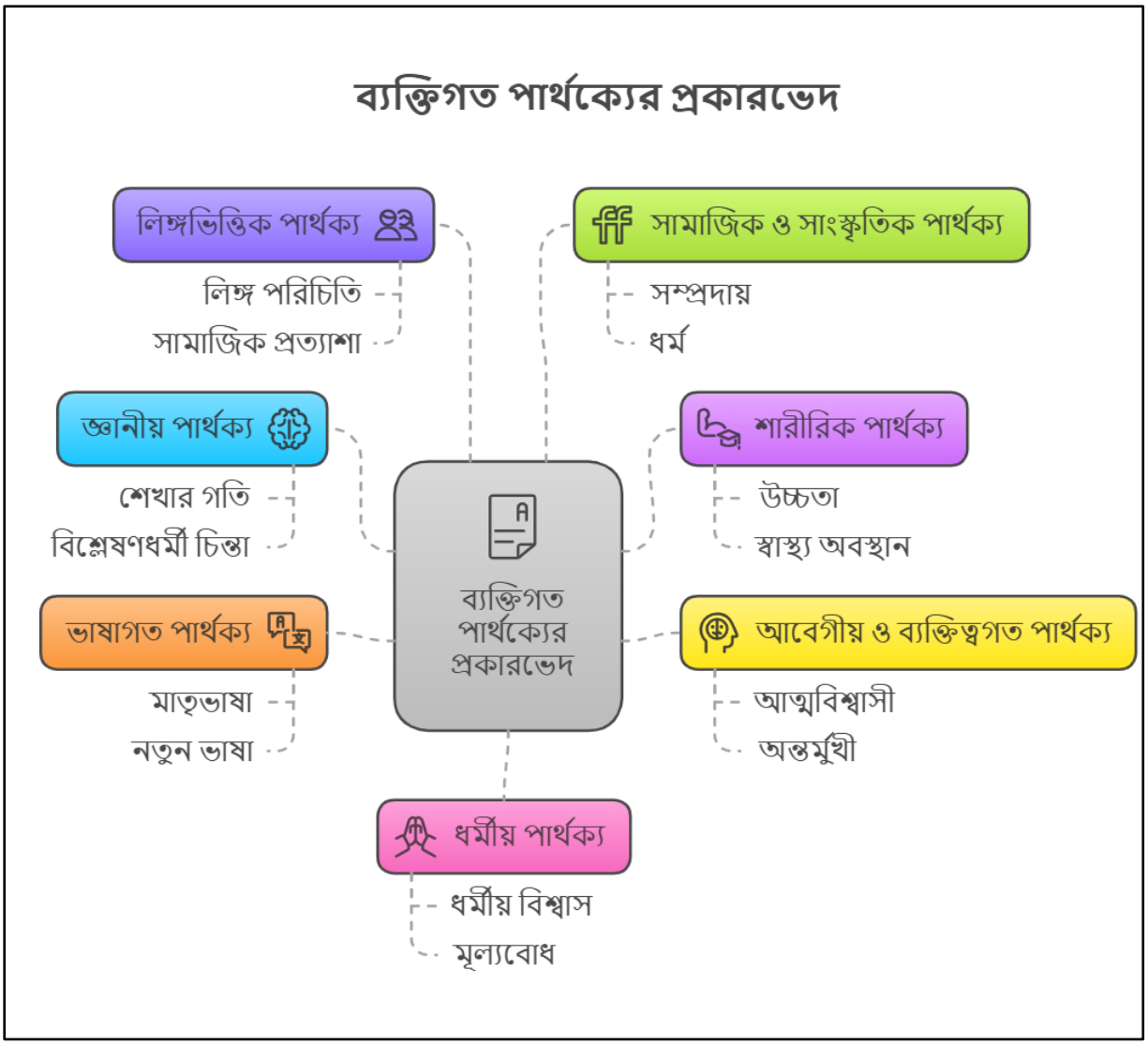

চিত্র: ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রকারভেদ

৬.৫ ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণসমূহ (Cause of Individual Difference)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন একজন শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে আলাদা? এর পেছনে বেশ কিছু জৈবিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কারণ কাজ করে। এই কারণগুলো শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতিটি স্তরে প্রভাব ফেলে এবং তার শেখার ধরণ, জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণসমূহ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়— (১) জন্মগত বা জেনেটিক কারণ এবং (২) পরিবেশগত বা বাহ্যিক কারণ।

৬.৫.১ জন্মগত বা জেনেটিক কারণ (Innate or Genetic Factors)

প্রত্যেক মানুষ কিছু শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তার ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

বংশগতির প্রভাব (Influence of Heredity)

- প্রতিটি শিশুর বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মূলত তার জিনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এই পার্থক্য দেখা যায়, কারণ জিনগত বৈচিত্র্য এক ভাইবোনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে।
- কিছু শিশুর সহজাত মেধা বেশি হয়, ফলে তারা দ্রুত শিখতে পারে, অন্যদিকে কেউ ধীরগতিতে শেখে।

শারীরিক ও জৈবিক পার্থক্য (Physical and Biological Differences)

- শিশুর জন্মগত শারীরিক অবস্থা, যেমন— মস্তিষ্কের গঠন, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা, দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তির সমস্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি করে।
- কিছু শিশুর শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ চাহিদা থাকলে তারা স্বাভাবিক শিক্ষার গতি অনুসরণ করতে পারে না।

লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য (Gender Differences)

- ছেলেমেয়েদের জিনগত ও হরমোনজনিত পার্থক্যের কারণে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ভিন্ন হয়।
- গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণত মেয়েরা ভাষাগত শিক্ষায় ভালো পারফর্ম করে, অন্যদিকে ছেলেরা গাণিতিক ও যৌক্তিক চিন্তাধারায় তুলনামূলকভাবে দক্ষ হয়। তবে এটি একটি সাধারণ প্রবণতা; ব্যক্তিগত পার্থক্য সব ক্ষেত্রেই থাকতে পারে।

৬.৫.২. পরিবেশগত বা বাহ্যিক কারণ (Environmental or External Factors)

পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও সংস্কৃতি শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও একজন শিশুর কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে পরিবেশ তার বিকাশের ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

পারিবারিক পরিবেশ (Family Environment)

- শিশুর প্রাথমিক শেখার স্থান হলো তার পরিবার। অভিভাবকদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি শিশুর মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।
- শিক্ষিত ও সচেতন অভিভাবকদের সন্তানরা সাধারণত শেখার জন্য বেশি অনুপ্রাণিত হয়।
- পারিবারিক সহিংসতা, অবহেলা বা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ শিশুর শেখার আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।

ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা (Language and Communication Skills)

- যেসব শিশুর মাতৃভাষা ও শিক্ষার ভাষা এক নয়, তারা শেখার ক্ষেত্রে বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।
- ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও শিক্ষাগত সাফল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

☞ শিক্ষার সুযোগ ও মান (Quality and Accessibility of Education)

- একজন শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, বিদ্যালয়ের গুণগত মান, পাঠদানের পদ্ধতি ও শিক্ষকের দক্ষতা তার শেখার সক্ষমতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়, যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিকাশে পার্থক্যের কারণ হতে পারে।

☞ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব (Social and Cultural Influences)

- সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ শিশুর ব্যক্তিত্ব ও শেখার প্রক্রিয়াকে গঠন করে।
- কিছু সমাজে শিক্ষা উচ্চ অগ্রাধিকার পায়, আবার কিছু সমাজে শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- শিশু যদি এমন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশ হয়, যেখানে শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা বা বৈষম্য বিদ্যমান, তবে সে শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে পারে।

☞ অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Conditions)

- দরিদ্র পরিবারগুলোর শিশুরা সাধারণত পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, ভালো বিদ্যালয় এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পায় না, যা তাদের শেখার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে।
- মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে ভালো হয়।

☞ ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত প্রভাব (Religious and Community Influences)

- শিশুর ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের রীতিনীতি তার শেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারে।
- কিছু সম্প্রদায়ে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়, যা তাদের শিক্ষার সুযোগ কমিয়ে দেয়।

☞ সহপাঠী ও বন্ধুপ্রভাব (Peer Influence)

- শিশুর বন্ধু ও সহপাঠীদের আচরণ তার শেখার আগ্রহ ও মানসিক বিকাশের ওপর প্রভাব ফেলে।
- ইতিবাচক বন্ধুত্ব শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, অন্যদিকে নেতিবাচক বন্ধুত্ব শিশুকে শিক্ষার প্রতি উদাসীন করে তুলতে পারে।

৬.৬ শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য (Distinction between Education and Individual Difference)

শিক্ষা একটি সার্বজনীন অধিকার, কিন্তু বাস্তবতা হলো—প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলাদা এবং তাদের শেখার ধরণ, গতি, বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ও চাহিদা একে অপরের থেকে ভিন্ন। শিক্ষার্থীদের এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণেই সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকর হয় না। একজন দক্ষ শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকা এই পার্থক্যগুলো বোঝা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি শিশুর জন্মগত ও পরিবেশগত পার্থক্য রয়েছে, যা তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরগতিতে শেখে। কেউ ভাষাগত শিক্ষায় পারদর্শী, আবার কেউ গাণিতিক দক্ষতায় উন্নত। কেউ একাকী পড়তে ভালোবাসে, আবার কেউ সহযোগিতামূলক শেখার মাধ্যমে ভালো করে। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো এই পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করে এমন শিক্ষাকৌশল প্রয়োগ করা, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হতে পারে।

☞ শিক্ষার ওপর ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রভাব (Influence of Individual differences on learning)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণে তারা একেকভাবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং এটি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে—

১. শেখার গতি ও দক্ষতা (Learning fluency and Efficiency):

একই পাঠক্রম সকল শিক্ষার্থীর জন্য কার্যকর হয় না। কিছু শিক্ষার্থী দ্রুত ধারণা গ্রহণ করতে পারে, আবার কেউ ধীরে শেখে। ফলে শিক্ষকদের পাঠদানের গতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা জরুরি।

২. শেখার শৈলী (Learning style):

শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ ভিন্ন হতে পারে—

- **দৃশ্যমান শিক্ষার্থী (Visual Learners):** ছবি, চিত্র বা গ্রাফ দেখে সহজে শেখে।
- **শ্রবণশক্তিনির্ভর শিক্ষার্থী (Auditory Learners):** বক্তৃতা, আলোচনা বা সংগীতের মাধ্যমে ভালো শেখে।
- **স্পর্শকাতর বা ব্যবহারিক শিক্ষার্থী (Kinesthetic Learners):** হাতে-কলমে কাজ করে বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে।

  শিক্ষকদের উচিত এই ভিন্নতাগুলো বুঝে পাঠদানের কৌশল নির্ধারণ করা।

৩. ভাষাগত পার্থক্যLanguage Difference):

যেসব শিক্ষার্থী মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তাই দ্বিভাষিক শিক্ষাপদ্ধতি, ভাষা সহায়ক উপকরণ এবং সহজবোধ্য ব্যাখ্যা শিক্ষার পরিবেশকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে পারে।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য (Socal and Culture Difference) :

একই শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিক্ষার্থীরা থাকে। তাদের পারিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস এবং সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য থাকে, যা তাদের শেখার প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য (Gender Difference):

শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন, তবে বাস্তবে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক প্রত্যাশা ও বৈষম্যের কারণে শিক্ষার অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) বিষয়গুলিতে কম অংশগ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়ে থাকে।

৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী (Special Child Education):

কিছু শিক্ষার্থী শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মায়, যার ফলে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শ্রবণ বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, অটিজম বা ডিসলেক্সিয়ার মতো শর্তযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য।

৬.৭ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিবেচনায় কার্যকর কৌশল (Effective Strategies for IndividualDdifferences in Education)

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে শিক্ষকদের নির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা জরুরি। কিছু কার্যকর কৌশল নিম্নরূপ—

1. **ভিন্নধর্মী শিক্ষাদান (Differentiated Instruction):**
    - শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন ও সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যবস্তুকে সাজানো।
    - কিছু শিক্ষার্থীকে ভিজ্যুয়াল উপকরণ প্রদান করা, আবার অন্যদের জন্য অডিও বা ব্যবহারিক পদ্ধতি ব্যবহার করা।
2. **স্বনির্দেশিত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা (Self-Paced & Personalized Learning):**
    - শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব গতিতে শেখার সুযোগ দেওয়া।
    - ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করে স্বনির্দেশিত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।
3. **সহযোগিতামূলক শিক্ষা (Collaborative Learning):**
    - দলগত কাজ, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা এবং সহপাঠীদের সহায়তার মাধ্যমে শেখার সুযোগ তৈরি করা।
    - ভিন্ন দক্ষতার শিক্ষার্থীদের একত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়া।
4. **ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education):**
    - বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পাঠক্রম ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
    - শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।
5. **মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতি (Diverse Assessment Methods):**
    - শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা নয়, বরং উপস্থাপনা, হাতে-কলমে কাজ এবং গবেষণাধর্মী মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা।

৬.৮ সারাংশ (Summary)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের বিষয়টিও এই ইউনিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে গঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ ও গতি, আবেগীয় অবস্থান, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকর নাও হতে পারে। এজন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং পার্থক্যভিত্তিক শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একজন দক্ষ শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের এই পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ, এই ইউনিটে শিশুদের শিক্ষাগত বিকাশের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভূমিকা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর ও প্রগতিশীল শিক্ষার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, প্রকৃত শিক্ষা হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা, পার্থক্য ও সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে।

৬.৯ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের কী কী কারণ থাকতে পারে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন?

২. একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য মোকাবিলা করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

৩. ভাষাগত বৈচিত্র্য শিক্ষার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে? এর জন্য কী ধরনের শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা উচিত?

৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা কী? এটি কীভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হতে পারে?

৫. কীভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে?

৬. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য কী? শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে বর্ণগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব?

৬.৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Rogoff, B. (২০০৩). *The Cultural Nature of Human Development.* Oxford University Press. UNESCO (২০১৭). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education.* UNESCO Publishing.
- Banks, J. A. (২০১৫). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching.* Pearson.
- Nieto, S. (২০১০). *Language, Culture, and Teaching: Critical Perspectives.* Routledge.
- Bourdieu, P. (১৯৯১). *Language and Symbolic Power.* Harvard University Press.
- Cummins, J. (২০০০). *Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire.* Multilingual Matters.

ব্লক ৩: শিশু: দৃষ্টিভঙ্গি (Child: Perspective)

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১. বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তা তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

৩. প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।

৪. প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।

৫. আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭.২ ভূমিকা (Introduction)

বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) দীর্ঘদিন ধরে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচিত বিষয়। প্রথাগত ধারণায় বুদ্ধিমত্তাকে সাধারণত স্মৃতিশক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হতো। তবে আধুনিক গবেষণাগুলো বুদ্ধিমত্তাকে বহুমাত্রিক হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে আবেগিক, সামাজিক, সৃজনশীল ও ব্যবহারিক দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বখ্যাত মনোবিজ্ঞানী হাওয়ার্ড গার্ডনার (১৯৮৩) প্রথম বহুবুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব (Multiple Intelligences Theory) উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি দেখান যে বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র ভাষাগত ও গাণিতিক দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শারীরিক, সংগীত, আন্তঃব্যক্তিক এবং অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার মাধ্যমেও প্রকাশিত হতে পারে। একইভাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিভাবান (Gifted) ও সৃজনশীল (Creative) শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব আলাদা। এদের যথাযথ পরিচর্যা না করা হলে তারা নিজেদের ক্ষমতা পুরোপুরি বিকাশ করতে পারে না। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা।

৭.৩ বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক নির্মাণ (Multidimensional Constructs of Intelligence)

বুদ্ধিমত্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, যুক্তিবোধ, শিক্ষার দক্ষতা এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্যকে নির্দেশ করে। এটি শুধু একক কোনো গুণ নয়, বরং বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল গঠন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতি ও সক্ষমতার বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করে। একটি শ্রেণিকক্ষে প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা দ্রুত শিখতে পারে, জটিল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় এবং গভীর চিন্তাভাবনার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে, সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা নতুন ও মৌলিক ধারণা তৈরিতে দক্ষ। তাই, শিক্ষকদের উচিত তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করা, যাতে তারা নিজেদের দক্ষতা সর্বোচ্চভাবে বিকাশ করতে পারে।

বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা (Definition of Intelligence)

বুদ্ধিমত্তা এমন একটি মানসিক ক্ষমতা যা ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, শেখার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধান, যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধিমত্তাকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

- **আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet)** প্রথম দিকের একজন মনোবিজ্ঞানী যিনি বুদ্ধিমত্তাকে শেখার দক্ষতা এবং নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হিসেবে বর্ণনা করেন।
- **ডেভিড ওয়েচসলার (David Wechsler)** বুদ্ধিমত্তাকে "একটি ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে কার্যকরভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাধারণ মানসিক দক্ষতা" বলে ব্যাখ্যা করেন।
- **গার্ডনারের বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব (Howard Gardner's Multiple Intelligences Theory)** অনুযায়ী, বুদ্ধিমত্তা কেবলমাত্র আইকিউ স্কোরের ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার সমষ্টি, যেমন ভাষাগত, যৌক্তিক-গাণিতিক, শারীরিক-চলন, সংগীত, আন্তঃব্যক্তিক ও অন্তর্ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা।

এই ধারণাগুলোর আলোকে, শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে বুদ্ধিমত্তার মাত্রা ও প্রকৃতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এটি জন্মগত ও পরিবেশগত উভয় উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার ধরন চিহ্নিত করে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন, যা তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

গিলফোর্ডের বুদ্ধিমত্তার মডেল (Guilford's Structure of Intellect Model)

জে.পি. গিলফোর্ড (J.P. Guilford) ১৯৬৭ সালে বুদ্ধিমত্তার কাঠামোগত মডেল (Structure of Intellect Model) উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিমত্তা একটি বহুমাত্রিক গঠন এবং এটি তিনটি প্রধান মাত্রায় বিভক্ত:

1. **অপারেশনস (Operations)**: ব্যক্তির চিন্তন প্রক্রিয়া যেমন মূল্যায়ন, স্মরণ, অনুধাবন, এবং সৃজনশীল চিন্তা।
2. **কনটেন্ট (Content)**: তথ্যের ধরন, যেমন ভাষাগত, চাক্ষুষ, শ্রবণমূলক, আচরণগত ইত্যাদি।
3. **প্রোডাক্টস (Products)**: চিন্তন প্রক্রিয়ার ফলাফল, যেমন ধারণা, সম্পর্ক, রূপান্তর, সিস্টেম ইত্যাদি।

এই তত্ত্বে গিলফোর্ড ১২০টি ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার উপাদান চিহ্নিত করেন, যা শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে।

গার্ডনারের বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব (Gardner's Multiple Intelligences Theory)

হাওয়ার্ড গার্ডনার (Howard Gardner) ১৯৮৩ সালে তার বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব (Multiple Intelligences Theory) উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি বলেন যে বুদ্ধিমত্তা একক মাত্রায় পরিমাপ করা যায় না, বরং এটি বিভিন্ন ধরনের মানসিক দক্ষতার সমন্বয়। তিনি আটটি প্রধান বুদ্ধিমত্তার ধরন চিহ্নিত করেন:

- **ভাষাগত বুদ্ধিমত্তা (Linguistic Intelligence)**: ভাষা শেখার এবং ব্যবহারের দক্ষতা।

- **যৌক্তিক-গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা (Logical-Mathematical Intelligence)**: সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণ ও গণিত সংক্রান্ত দক্ষতা।
- **চাক্ষুষ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তা (Visual-Spatial Intelligence)**: চিত্রকল্প ও স্থানিক ধারণার দক্ষতা।
- **শারীরিক-চলন বুদ্ধিমত্তা (Bodily-Kinesthetic Intelligence)**: শারীরিক গতি ও সমন্বয়ের দক্ষতা।
- **সংগীত-বুদ্ধিমত্তা (Musical Intelligence)**: সুর, ছন্দ এবং বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত দক্ষতা।
- **আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal Intelligence)**: অন্যদের আবেগ বোঝার এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা।
- **অন্তর্ব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal Intelligence)**: আত্মজ্ঞান ও স্ব-অনুভূতির দক্ষতা।
- **প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা (Naturalistic Intelligence)**: প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝার এবং পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা।

গার্ডনারের তত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার ধরন চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করা। বুদ্ধিমত্তা একটি বহুমাত্রিক এবং পরিবর্তনশীল ধারণা, যা বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকেন। স্পিয়ারম্যান, গিলফোর্ড ও গার্ডনারের তত্ত্বগুলো বুদ্ধিমত্তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাকে ব্যাখ্যা করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে এ ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নির্দেশ করে। একজন দক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার ধরন চিহ্নিত করে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন, যা তাদের শেখার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-গুণক তত্ত্ব (Spearman's Two-Factor Theory)

চার্লস স্পিয়ারম্যান (Charles Spearman) ১৯০৪ সালে বুদ্ধিমত্তার দ্বি-গুণক তত্ত্ব (Two-Factor Theory) উপস্থাপন করেন। তিনি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখান যে বুদ্ধিমত্তা একক নয়, বরং এটি দুটি প্রধান উপাদান দ্বারা গঠিত।

তত্ত্বের মূল ধারণা (Concept of the Theory)

স্পিয়ারম্যানের মতে, প্রতিটি ব্যক্তি যে কোনো মানসিক কাজ সম্পাদনের সময় দুই ধরনের বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করেন:

- **g-ফ্যাক্টর (General Intelligence Factor):**
    1. এটি সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বোঝায়, যা ব্যক্তি যে কোনো ধরনের মানসিক কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করেন।
    2. এটি সমস্যা সমাধান, যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং শেখার ক্ষমতার মতো বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল।
    3. g-ফ্যাক্টর শক্তিশালী হলে ব্যক্তি সাধারণত সব ধরনের কাজেই ভালো করতে পারেন।

- **s-ফ্যাক্টর (Specific Intelligence Factor):**
    1. এটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বোঝায়, যা ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে ব্যবহার করেন।
    2. বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে s-ফ্যাক্টরের তারতম্য দেখান।
    3. উদাহরণস্বরূপ, কেউ গণিতে দক্ষ হতে পারেন কিন্তু ভাষাগত কাজে দুর্বল হতে পারেন।

তত্ত্বের গুরুত্ব (Importance of the Theory)

- **শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব:** এই তত্ত্ব বোঝায় যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা (g-ফ্যাক্টর) থাকলেও নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা (s-ফ্যাক্টর) আলাদা হতে পারে।
- **মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবদান:** স্পিয়ারম্যানের তত্ত্ব পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **শিক্ষণ কৌশল:** শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীদের g-ফ্যাক্টরের পাশাপাশি s-ফ্যাক্টরের উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া, যাতে তারা নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

সমালোচনা (Criticism)

- অনেক গবেষক মনে করেন যে বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র g ও s-ফ্যাক্টর দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং এটি বহুমাত্রিক (যেমন গার্ডনারের বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব) হতে পারে।
- গিলফোর্ডের মতো মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বুদ্ধিমত্তাকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং এটি শুধুমাত্র দুটি ফ্যাক্ট রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

স্পিয়ারম্যানের দ্বি-গুণক তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি বুঝতে সাহায্য করে যে বুদ্ধিমত্তা একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, তবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেও ব্যক্তির দক্ষতা আলাদা হতে পারে। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের g ও s-ফ্যাক্টর চিহ্নিত করে তাদের শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করা।

গিলফোর্ডের বুদ্ধিমত্তার মডেল (Guilford's Structure of Intellect Model)

J.P. Guilford (জয় পল গিলফোর্ড) ১৯৫৬ সালে বুদ্ধিমত্তার গঠন বিশ্লেষণ করে তার **"Structure of Intellect (SOI) Model"** উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বুদ্ধিমত্তা একক কোনো গুণ নয়, বরং এটি বহুমাত্রিক এবং বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত। গিলফোর্ড বুদ্ধিমত্তাকে তিনটি প্রধান মাত্রায় ভাগ করেছেন, যা একসঙ্গে মিলে মোট **১৫০টি স্বতন্ত্র মানসিক ক্ষমতা** তৈরি করে।

গিলফোর্ডের বুদ্ধিমত্তার তিনটি মাত্রা (Three Dimensions of Intelligence)

গিলফোর্ডের মতে, বুদ্ধিমত্তাকে তিনটি প্রধান মাত্রায় ভাগ করা যায়:

১. অপারেশন (Operations) - মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া:

- বুদ্ধিমত্তার যে অংশ চিন্তা-ভাবনা, বিশ্লেষণ এবং সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

- এটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত:
    - **জ্ঞান (Cognition):** নতুন তথ্য বোঝা এবং শিখতে পারা।
    - **স্মৃতি (Memory):** তথ্য মনে রাখা এবং প্রয়োগ করা।
    - **প্রযোজন (Divergent Thinking):** সৃজনশীলভাবে নতুন ধারণা তৈরি করা।
    - **সংযোজন (Convergent Thinking):** নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছানো।
    - **মূল্যায়ন (Evaluation):** তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২. বিষয়বস্তু (Content) - জ্ঞানের ধরন:

- মানুষ কোন ধরনের তথ্য নিয়ে কাজ করে, তার ভিত্তিতে এটি চার ভাগে বিভক্ত:
    - **চিত্রধারণ (Figural):** দৃশ্যমান বা চাক্ষুষ তথ্য।
    - **প্রতীক (Symbolic):** সংকেত, সংখ্যা বা চিহ্ন নিয়ে কাজ করা।
    - **বাক্যিক (Semantic):** ভাষা ও শব্দের অর্থ বোঝা।
    - **আচরণগত (Behavioral):** মানুষের সামাজিক ও আবেগজনিত আচরণ বোঝা।

৩. উৎপাদন (Product) - চিন্তার ফলাফল:

মানুষ কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং কোন উপায়ে নতুন কিছু তৈরি করে, তার ভিত্তিতে এটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত:

1. **এককতা (Units):** নির্দিষ্ট তথ্য বা বিষয় চিহ্নিত করা।
2. **শ্রেণীবিভাগ (Classes):** বিভিন্ন তথ্য গোষ্ঠীভুক্ত করা।
3. **সম্পর্ক (Relations):** একাধিক তথ্য বা ধারণার মধ্যে সংযোগ খোঁজা।
4. **প্রণালী (Systems):** বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে কাঠামো তৈরি করা।
5. **রূপান্তর (Transformations):** একটি তথ্য বা ধারণাকে নতুনভাবে পরিবর্তন করা।
6. **অনুমান (Implications):** বিদ্যমান তথ্য থেকে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

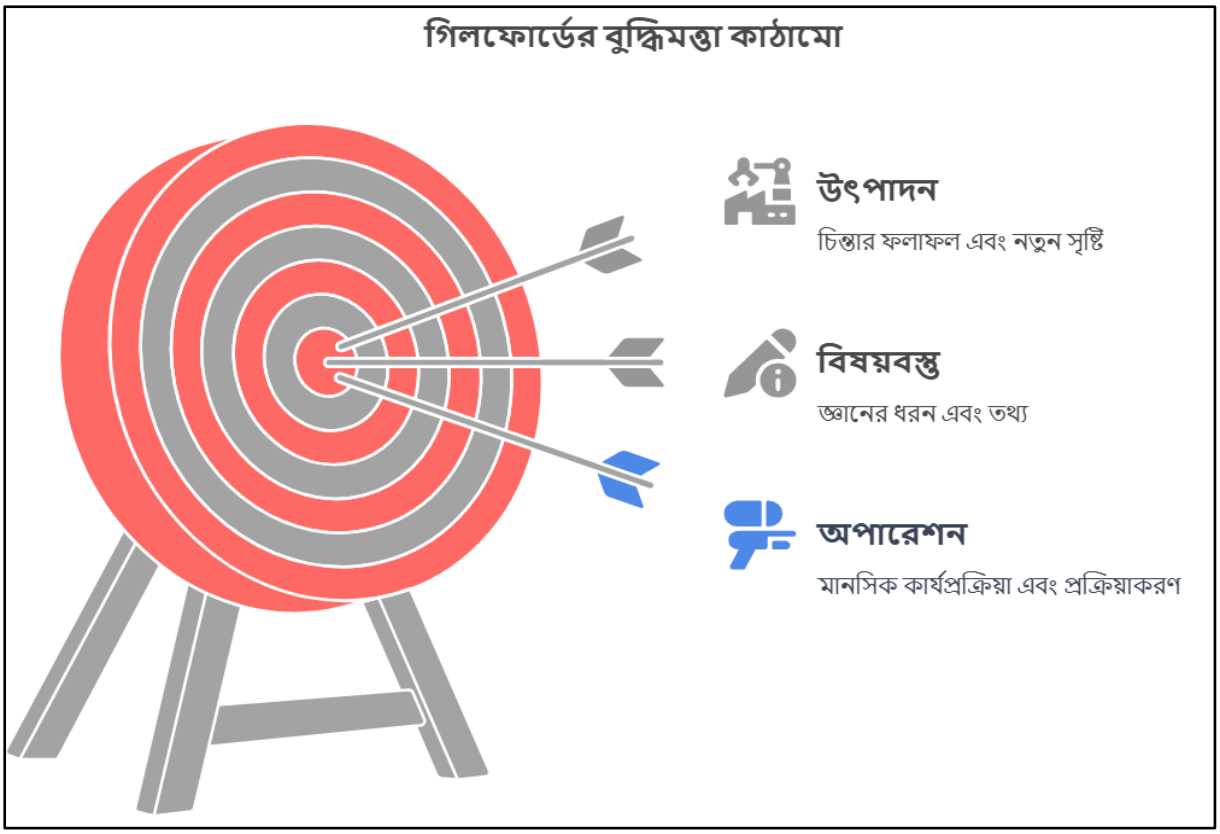

চিত্র: গিলফোর্ডের বুদ্ধিমত্তার তিনটি মাত্রা

গিলফোর্ডের মডেলের গুরুত্ব (Importance of Guildford Model)

- এই মডেল আমাদের শেখায় যে বুদ্ধিমত্তা শুধু একক কোনো ক্ষমতা নয়, বরং এটি বিভিন্ন দক্ষতা ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে গঠিত।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই মডেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি, কারণ এটি বহুমাত্রিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেয়।
- গিলফোর্ডের মডেল পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষাসমূহ (IQ Test) এবং সৃজনশীলতার মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়েছে।

সমালোচনা (Criticism)

- এই মডেল অনেক বেশি জটিল, কারণ এটি ১৫০ টি স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তার উপাদানকে চিহ্নিত করেছে, যা প্রয়োগ করা কঠিন।
- কিছু গবেষক মনে করেন যে এত বেশি উপাদান প্রয়োজনীয় নয় এবং এটি বাস্তব জীবনে ব্যবহার করা কঠিন হতে পারে।

গিলফোর্ডের বুদ্ধিমত্তার মডেল আমাদের বোঝায় যে বুদ্ধিমত্তা একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও বহুমুখী করে তোলা।

গার্ডনারের বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক তত্ত্ব (Gardner's Theory of Multiple Intelligences)

১৯৮৩ সালে হাওয়ার্ড গার্ডনার (Howard Gardner) তার **"Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences"** গ্রন্থে **বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক তত্ত্ব (Multiple Intelligences Theory - MI Theory)** উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বুদ্ধিমত্তা কোনো একক ক্ষমতা নয়, বরং এটি বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা এবং প্রতিভার সমন্বয়ে গঠিত। গার্ডনার বলেন, প্রতিটি মানুষ ভিন্নভাবে শেখে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তার ধরনও আলাদা হতে পারে।

গার্ডনারের বুদ্ধিমত্তার আটটি ধরন (eight Types of Intelligence of Gardener)

গার্ডনার মূলত আটটি ভিন্নধর্মী বুদ্ধিমত্তার কথা বলেন, যা মানুষের শেখার ধরন, সমস্যা সমাধান এবং জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করে।

১. ভাষাগত বা মৌখিক বুদ্ধিমত্তা (Linguistic Intelligence)

- ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা, বক্তৃতা ও লেখার ক্ষমতা, নতুন ভাষা শেখার সক্ষমতা।
- সাংবাদিক, লেখক, কবি, আইনজীবী, বক্তা এই বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী।
- উদাহরণ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম শেকসপিয়ার।

২. গণিতীয়-যুক্তিবোধ বা লজিক্যাল বুদ্ধিমত্তা (Logical-Mathematical Intelligence)

- সমস্যা সমাধান, সংখ্যা, গণিত, বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনায় দক্ষতা।
- বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এই বুদ্ধিমত্তা বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: আলবার্ট আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন।

৩. চাক্ষুষ-স্থানিক বুদ্ধিমত্তা (Visual-Spatial Intelligence)

- ছবি ও মানসিক চিত্রের মাধ্যমে চিন্তা করা, দৃষ্টিগত উপলব্ধি এবং নকশা বা পরিকল্পনা তৈরিতে পারদর্শিতা।
- স্থপতি, শিল্পী, ডিজাইনার, চিত্রশিল্পী, চিত্রগ্রাহকরা এই বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী।
- উদাহরণ: লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, পাবলো পিকাসো।

৪. শারীরিক-কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

- শরীরের নড়াচড়ার মাধ্যমে শেখার ক্ষমতা, শারীরিক দক্ষতা ও সমন্বয়।
- খেলোয়াড়, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, কারিগরদের মধ্যে এই বুদ্ধিমত্তা বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: উসাইন বোল্ট, চার্লি চ্যাপলিন।

৫. বাদ্যযন্ত্র-সংগীত বিষয়ক বুদ্ধিমত্তা (Musical Intelligence)

- সুর, তাল, ছন্দ, সংগীতের প্রতি সংবেদনশীলতা, গান গাওয়া বা বাজানোর দক্ষতা।
- সংগীতজ্ঞ, গায়ক, বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে এই বুদ্ধিমত্তা বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: লুডউইগ ভ্যান বিটোফেন, মোজার্ট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬. আন্তঃব্যক্তিক বা সামাজিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal Intelligence)

- অন্যদের বোঝার দক্ষতা, তাদের আবেগ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এবং কার্যকরভাবে যোগাযোগ করা।
- শিক্ষক, নেতা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মীদের মধ্যে এই বুদ্ধিমত্তা বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা।

৭. অন্তর্ব্যক্তিক বা আত্ম-জ্ঞানমূলক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal Intelligence)

- নিজের আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা।
- দার্শনিক, কবি, ধর্মীয় নেতা, মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ।

৮. প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত বুদ্ধিমত্তা (Naturalistic Intelligence)

- প্রকৃতি, প্রাণী, পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা, প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য বোঝার দক্ষতা।
- কৃষিবিদ, পরিবেশবিদ, জীববিজ্ঞানী, ভূগোলবিদদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।
- উদাহরণ: চার্লস ডারউইন, ডেভিড অ্যাটেনবরো।

গার্ডনারের তত্ত্বের গুরুত্ব (Importance of Gardener's Theory)

- প্রচলিত আইকিউ পরীক্ষার ধারণার বাইরে গিয়ে এই তত্ত্ব প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের শক্তি অনুযায়ী শেখার পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়।
- বিভিন্ন ধরনের পেশার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।
- শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন অনুযায়ী পাঠদান কৌশল নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

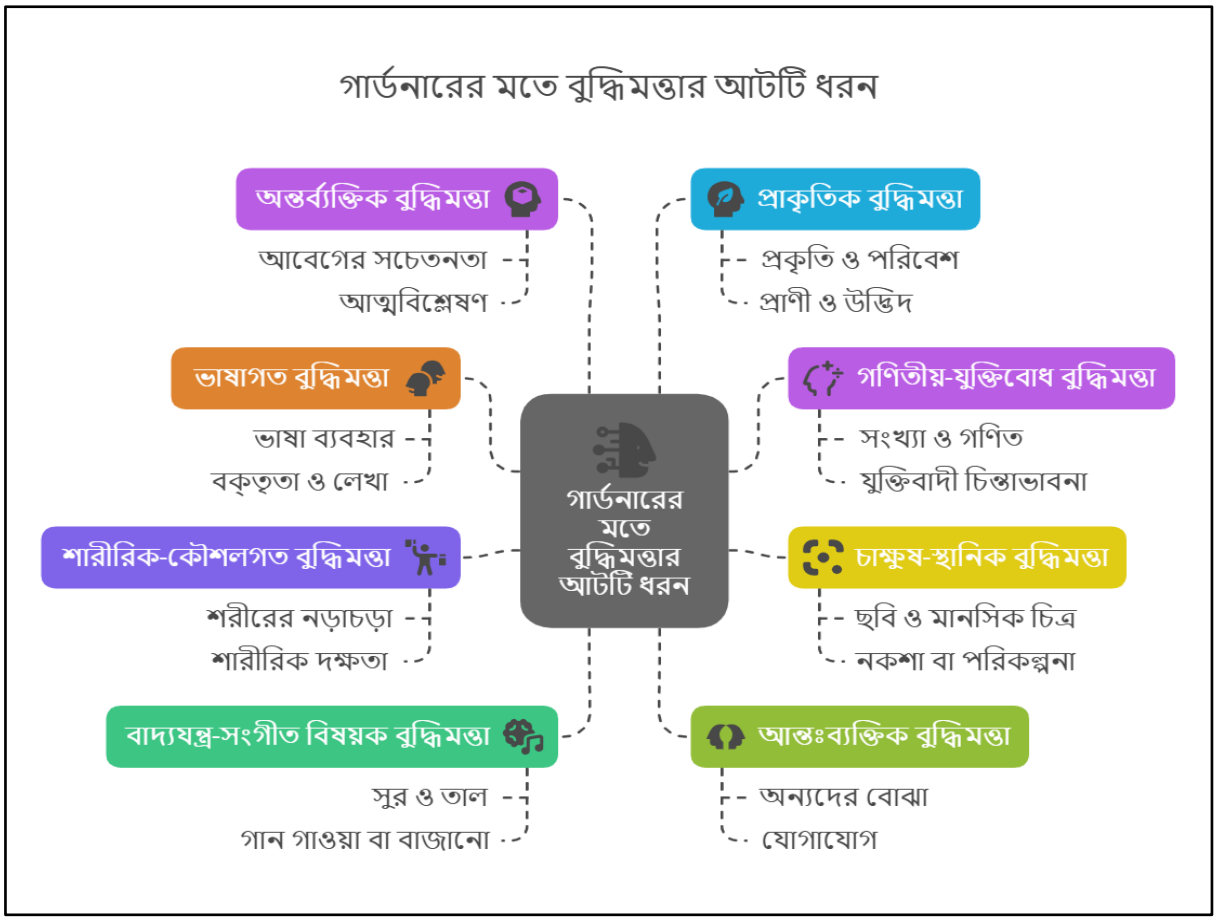

চিত্র: গার্ডনারের বুদ্ধিমত্তার আটটি ধরন

সমালোচনা (Criticism)

- কিছু গবেষক মনে করেন, গার্ডনারের বুদ্ধিমত্তার ধারণাগুলি আসলে "দক্ষতা" বা "প্রতিভা", যা বুদ্ধিমত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এখনও তার এই তত্ত্বের জন্য পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ নেই।
- এই তত্ত্বের মূল্যায়ন পদ্ধতি এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত নয়।

গার্ডনারের **বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক তত্ত্ব** শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ধারণা, যা ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্ন ক্ষমতা ও প্রতিভাকে মূল্যায়ন করার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শেখার কৌশল উন্নত করে, তবে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী তাদের স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

ট্রায়ার্কিক তত্ত্ব (Sternberg's Triarchic Theory of Intelligence)

রবার্ট স্টার্নবার্গ (১৯৮৫) তার ট্রায়ার্কিক তত্ত্বে বুদ্ধিমত্তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

১. বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধিমত্তা (Analytical Intelligence): সমস্যা সমাধানের দক্ষতা।

২. সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা (Creative Intelligence): নতুন ধারণা তৈরির ক্ষমতা।

৩. বাস্তবিক বুদ্ধিমত্তা (Practical Intelligence): বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতা।

শিক্ষায় বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব (Importance of Intelligence of Education)

শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জনের একটি প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন কৌশল, পরিবেশ ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা মূলত তাদের **বুদ্ধিমত্তার মাত্রার উপর নির্ভর করে।** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় **বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিকতা** (Multiple Intelligences) বিবেচনায় রেখে পাঠদান এবং মূল্যায়ন করা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থীর শিখন-প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হয়।

১. ব্যক্তির শিখন-প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের **বোঝার ক্ষমতা, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমালোচনামূলক চিন্তা** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী যদি গণিতীয়-যুক্তিবাদী বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়, তাহলে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে সে দক্ষ হবে। অপরদিকে, একজন ভাষাগত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বেশি পারদর্শী হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধিমত্তা শেখার ধরনকে প্রভাবিত করে।

২. বিভিন্ন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব

বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন মাত্রা শিক্ষার্থীদের শেখার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। যেমন—

- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:** গণিতীয়-যুক্তিবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গবেষণায় দক্ষ হয়।
- **ভাষা ও সাহিত্য:** ভাষাগত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায় পারদর্শী হয়।
- **শিল্প ও সংগীত:** চাক্ষুষ-স্থানিক এবং বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা চিত্রকলা, নৃত্য ও সংগীত ক্ষেত্রে সফল হতে পারে।
- **খেলাধুলা ও শারীরিক দক্ষতা:** শারীরিক-কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা ক্রীড়া, অভিনয় এবং নৃত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের কেবল এক ধরনের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত নয়। গার্ডনারের **বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক তত্ত্ব** অনুসারে, একজন শিক্ষার্থী হয়তো পরীক্ষার ফলাফলে দুর্বল, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। তাই, শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বুঝে তাদের জন্য উপযুক্ত শেখার পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

৪. প্রতিভাবান এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিকাশ

কিছু শিক্ষার্থী বুদ্ধিমত্তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভাবান হয়, যেমন—

- **উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (Gifted) শিক্ষার্থীরা** দ্রুত শিখতে পারে, গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে এবং নতুন নতুন ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়।
- **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের** শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুতরাং, শিক্ষকদের উচিত **অভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ না করে** শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী পাঠদান করা।

৫. দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

একটি জাতির উন্নয়ন নির্ভর করে দক্ষ মানবসম্পদের উপর, যা মূলত **শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয়।** সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করলে একজন শিক্ষার্থী তার নিজস্ব **ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে** এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা **শেখার ধরন, দক্ষতা অর্জন, সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের **বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী পাঠদান, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে** তাদের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব হবে।

৭. ৪ শ্রেণিকক্ষে প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে, যাদের চিন্তা-ভাবনা, শিখন-প্রক্রিয়া, সৃজনশীলতা ও প্রতিভার ধরণ একে অপরের থেকে ভিন্ন। **প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় দ্রুত শিখতে সক্ষম, নতুন ধারণা তৈরি করতে দক্ষ এবং সৃজনশীল সমাধান বের করতে পারদর্শী।** তাদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত করা হলে তারা নিজেদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে।

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও প্রতিভার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিখন-প্রক্রিয়ায় দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। তাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—

- **উচ্চ শিখন ক্ষমতা:** তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জটিল বিষয়বস্তু শিখতে পারে।
- **তীব্র কৌতূহল ও অনুসন্ধানী মনোভাব:** নতুন জিনিস জানার আগ্রহ এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা থাকে।
- **উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা:** তারা জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং সমালোচনামূলক চিন্তার মাধ্যমে নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে পারে।
- **সৃজনশীলতা:** তারা কল্পনাপ্রবণ, নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে এবং প্রচলিত ধারার বাইরে চিন্তা করতে পারে।

- **স্বাধীন চিন্তাভাবনা:** তারা নিয়ম মেনে চলার চেয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা করে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

সৃজনশীল শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা, কৌশল এবং সমস্যার সমাধান বের করতে পারদর্শী। তারা কেবল বিদ্যমান তথ্য বা জ্ঞানকে আত্মস্থ করে না, বরং নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

- **নতুন ধারণা ও উদ্ভাবন:** তারা প্রচলিত শিক্ষার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে।
- **উদ্ভাবনী চিন্তা:** তাদের চিন্তাধারা নমনীয় এবং তারা একাধিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে।
- **ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা:** তারা ব্যর্থতাকে ভয় পায় না এবং নতুন কিছু চেষ্টা করতে আগ্রহী থাকে।
- **অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ক্ষমতা:** তারা চারপাশের জিনিস পর্যবেক্ষণ করে এবং সেখান থেকে নতুন ধারণা গঠন করতে পারে।
- **শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে দক্ষতা:** অনেক সৃজনশীল শিক্ষার্থী শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে।

শ্রেণিকক্ষে প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করে এই শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে। যেমন—

- **পর্যবেক্ষণ:** শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের আচরণ, চিন্তার ধরন এবং শেখার গতিকে পর্যবেক্ষণ করা।
- **অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স:** অনেক সময় পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা যায়, তবে সব ক্ষেত্রে নয়।
- **সৃজনশীল কাজ:** শিক্ষার্থীরা যদি লেখালেখি, চিত্রাঙ্কন, প্রকল্প বা নতুন আবিষ্কারে আগ্রহী হয়, তবে সেটিও প্রতিভাবান ও সৃজনশীলতার পরিচায়ক হতে পারে।
- **সমালোচনামূলক ও উদ্ভাবনী চিন্তা:** কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা নতুন উপায় অবলম্বন করছে কি না, সেটিও লক্ষ্য করা জরুরি।

শ্রেণিকক্ষে প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ কৌশল

সাধারণ শিক্ষণ পদ্ধতি অনেক সময় প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট কার্যকর হয় না। তাই, শিক্ষকদের উচিত তাদের জন্য বিশেষ কিছু শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করা।

১. পার্থক্যকৃত নির্দেশনা (Differentiated Instruction)

শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। এতে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা আরও চ্যালেঞ্জিং বিষয়বস্তু শিখতে পারবে।

২. সমস্যা-ভিত্তিক শিক্ষণ (Problem-Based Learning)

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা জটিল সমস্যা সমাধান করতে ভালোবাসে। তাই, তাদের বাস্তব-জীবনের সমস্যার সমাধানে গবেষণা এবং নতুন উপায় উদ্ভাবনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

৩. উন্মুক্ত-প্রশ্ন ও মুক্ত আলোচনার সুযোগ প্রদান

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার সুযোগ তৈরি করতে **উন্মুক্ত প্রশ্ন ও বিতর্কের মাধ্যমে শেখার সুযোগ দিতে হবে**।

৪. গবেষণা ও স্বাধীন প্রকল্পে অংশগ্রহণ

শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা এবং নতুন প্রকল্প তৈরির জন্য উৎসাহিত করা উচিত, যা তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক হবে।

৫. মাল্টিমিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করলে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা সহজেই বিষয়বস্তু বুঝতে পারে এবং বিভিন্ন ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে উদ্ভাবনী চিন্তা গড়ে তুলতে পারে।

৬. প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম

বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, সৃজনশীল লেখালেখি প্রতিযোগিতা, ও কুইজ প্রতিযোগিতা এই ধরনের কার্যক্রমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করলে তাদের প্রতিভা আরও বিকশিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

অনেক সময় প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন—

- **একঘেয়েমি ও বিরক্তি:** সাধারণ পাঠদান পদ্ধতি অনেক সময় তাদের জন্য বোরিং হয়ে যায়।
- **অতিরিক্ত প্রত্যাশা:** শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজ তাদের কাছ থেকে অত্যধিক প্রত্যাশা করে, যা তাদের উপর মানসিক চাপ তৈরি করে।
- **সামাজিক সমস্যা:** অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থী সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহ কম দেখায় বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যেতে পারে।
- **সঠিক নির্দেশনা ও চ্যালেঞ্জের অভাব:** অনেক সময় শিক্ষকেরা প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জিং টাস্ক তৈরি করেন না, ফলে তারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে না।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাদের যথাযথ চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হলে তারা নিজেদের প্রতিভাকে আরও বিকশিত করতে পারবে। শিক্ষকদের উচিত শ্রেণিকক্ষে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ, উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি এবং গবেষণা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা তাদের প্রতিভাকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের চাহিদা

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং দ্রুত শেখার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে তাদের শিক্ষাগত ও মানসিক চাহিদাও আলাদা হয়। সাধারণ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি তাদের জন্য সবসময় উপযোগী হয় না। এই শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরিবেশ ও সহায়তা প্রদান করা না হলে তাদের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ কমে যেতে পারে। সঠিক নির্দেশনা, উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল এবং মানসিক সমর্থন প্রদান করলে তারা তাদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারবে।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের প্রধান চাহিদাসমূহ

১. উন্নত ও চ্যালেঞ্জিং পাঠ্যক্রম

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা সাধারণত দ্রুত শেখে এবং সহজ বিষয়বস্তুতে আগ্রহ হারায়। তাই তাদের জন্য পাঠ্যক্রমকে আরও গভীর, চ্যালেঞ্জিং ও গবেষণাধর্মী করতে হবে।

- পাঠ্যসূচিতে **উন্নত বিষয়বস্তু** সংযোজন করা
- **উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের কার্যক্রম** সংযোজন
- বাস্তবজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা ও প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম

২. স্বাধীন শেখার সুযোগ

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নিজস্ব গতিতে এবং আগ্রহ অনুযায়ী শিখতে চায়। তাদের জন্য স্বাধীনভাবে শেখার সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন।

- **গবেষণামূলক কার্যক্রম** চালানোর সুযোগ দেওয়া
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয়ে **স্বনির্ধারিত প্রকল্প** করতে উৎসাহিত করা
- **উন্মুক্ত পাঠদান পদ্ধতি** অনুসরণ করা, যেখানে তারা নিজেরাই সমস্যার সমাধান বের করতে পারে

৩. সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ

সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা নতুন আইডিয়া, শিল্প, সাহিত্য বা উদ্ভাবনী চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে।

- **শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ** দেওয়া
- **সৃজনশীল প্রকল্প ও কর্মশালার আয়োজন** করা
- **মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল টুলের ব্যবহার** করে সৃজনশীল শেখার সুযোগ প্রদান

৪. মানসিক ও সামাজিক সহায়তা

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা অনেক সময় একাকীত্ব অনুভব করে বা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মানসিক সমর্থন দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- শিক্ষকদের উচিত তাদের **আবেগিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো বোঝা**
- **পিয়ার গ্রুপ বা সমমনা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেওয়া**
- মানসিক চাপ কমানোর জন্য **পরামর্শ প্রদান ও গাইডেন্স** দেওয়া

৫. ভিন্নধর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করলে তাদের প্রকৃত দক্ষতা বোঝা কঠিন হয়।

- উদ্ভাবনী মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা (যেমন: প্রকল্পমূলক মূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান ভিত্তিক মূল্যায়ন)
- সৃজনশীল চিন্তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরি করা
- উন্মুক্ত-সমাপ্তি (Open-ended) প্রশ্ন ও চিন্তামূলক কার্যক্রম সংযোজন করা

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ দেওয়া হলে তারা সমাজ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এজন্য শিক্ষকদের উচিত তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং শিক্ষাক্রম তৈরি করা, স্বাধীন ও সৃজনশীল চিন্তার সুযোগ দেওয়া, মানসিক সহায়তা প্রদান করা এবং বিশেষায়িত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা। যদি এই চাহিদাগুলো পূরণ করা যায়, তবে তারা তাদের মেধা ও দক্ষতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকশিত করতে সক্ষম হবে।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভিন্নভাবে শেখে, চিন্তা করে এবং নতুন ধারণা তৈরি করতে পারে। তাদের দ্রুত শেখার ক্ষমতা, গভীর চিন্তনশীলতা এবং সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকে। তবে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রায়ই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে পারে না। এজন্য তাদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার উপাদানসমূহ

১. অভিযোজিত ও উন্নত পাঠক্রম

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা সাধারণ পাঠ্যক্রমের তুলনায় অধিকতর গভীর ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়বস্তুতে আগ্রহী হয়।

- **অভিযোজিত পাঠ্যক্রম**: প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে তারা দ্রুত শেখার পাশাপাশি জটিল বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে।
- **উন্নত পাঠ্যবস্তুর সংযোজন**: উচ্চতর স্তরের গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং গবেষণাধর্মী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- **উচ্চতর বিশ্লেষণ ও সমস্যার সমাধান**: উদ্ভাবনী চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ দেওয়া।

২. গতিশীল ও নমনীয় শিক্ষণ পদ্ধতি

প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতির বাইরে গিয়ে শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে।

- **স্বনির্ভর ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা**: শিক্ষার্থীদের স্ব-শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেওয়া উচিত।
- **প্রকল্পভিত্তিক শেখানো**: বাস্তব জীবনের সমস্যার উপর গবেষণা এবং সমাধানের কৌশল শেখানো।
- **প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক শিক্ষণ**: উচ্চতর চিন্তার উদ্দীপনা জাগাতে শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত-প্রশ্নে উৎসাহিত করা।

৩. স্বাধীন ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ

সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- **নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ**: সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন নতুন ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করে, যা তাদের শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত।
- **বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানের কৌশল**: তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে উৎসাহিত করা, যাতে তারা উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারে।
- **শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ**: প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা প্রায়শই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশেষ আগ্রহী হয়। তাই তাদের এসব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত।

৪. উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হলে প্রচলিত পরীক্ষার পাশাপাশি আরও উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

- **প্রকল্পভিত্তিক মূল্যায়ন**: শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা এবং গবেষণার ফলাফল মূল্যায়নের অংশ হওয়া উচিত।
- **উন্মুক্ত-সমাপ্তি (Open-ended) প্রশ্ন**: যা তাদের বিশ্লেষণী ও সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করবে।
- **অভিনব উপস্থাপনা ও ডেমোনস্ট্রেশন**: শিক্ষার্থীদের তাদের ধারণাগুলো উপস্থাপন করতে দেওয়া এবং প্রয়োগিকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।

৫. বিশেষ সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি শিক্ষা পরিবেশ প্রয়োজন, যা তাদের চিন্তা ও দক্ষতার বিকাশকে উৎসাহিত করবে।

- **উদ্দীপনামূলক শ্রেণিকক্ষ**: যেখানে তাদের মুক্তভাবে চিন্তা ও ধারণা প্রকাশের সুযোগ থাকবে।
- **সামাজিক-মানসিক সহায়তা**: তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- **শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা**: শিক্ষকদের উচিত প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলো বোঝা এবং তাদের সহায়তা প্রদান করা।

প্রতিভাবান এবং সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, উপকরণ এবং নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব। শিক্ষা শুধু তাদের পরীক্ষার ফলাফলে উন্নতি আনার জন্যই নয়, বরং তাদের চিন্তা-ভাবনার বিস্তৃতি ঘটানোর জন্যও হওয়া উচিত। তাই, তাদের জন্য অভিযোজিত পাঠ্যক্রম, উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি, উন্নত মূল্যায়ন এবং সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করা জরুরি, যা তাদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে।

৭.৫ সারাংশ (Summary)

বুদ্ধিমত্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা শুধুমাত্র একক পরিমাপের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গার্ডনারের বহুবুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব ও স্টার্নবার্গের ট্রায়ার্কিক তত্ত্ব আমাদের দেখায় যে শিক্ষার্থীদের শেখার শৈলী এবং বুদ্ধিমত্তার ধরন বিভিন্ন হতে পারে। প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীরা বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, যা তাদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত করতে সহায়তা করতে পারে।

৭. ৬ স্ব-মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক ধারণা বলতে কী বোঝায়?

২. গার্ডনারের বহুবুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধিমত্তার প্রধান কয়টি ধরন রয়েছে? এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন।

৩. স্টার্নবার্গের ট্রায়ার্কিক তত্ত্বের তিনটি উপাদান কী কী? প্রতিটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করুন।

৪. বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের প্রথাগত পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা কী কী?

৫. প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য কীভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করা যায়?

৬. সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে?

৭. প্রতিভাবান ও সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কৌশল কীভাবে কার্যকর হতে পারে?

৮. আপনি কী মনে করেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিক ব্যবহারের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে? যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিন।

৯. বাস্তব জীবনে বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন রকম ব্যবহার কীভাবে দেখা যায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

১০. আপনি কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন?

৭. ৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Gardner, H. (১৯৮৩). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.
- Sternberg, R. J. (১৯৮৫). Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. Cambridge University Press.
- National Education Policy (২০২০). Ministry of Education, Government of India.

একক ৮: শ্রেণিকক্ষে সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক ও বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি (Addressing Socio-culturally Marginalized and Specially challenged Learners in the Classroom)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১) সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা।

২) বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন) শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করা।

৩) শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝে কার্যকর শিক্ষণ-কৌশল প্রয়োগের দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

৪) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা।

৮.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার, যা প্রত্যেক শিশুর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে বাস্তবে, সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা এবং বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রায়শই শিক্ষার মূলধারার বাইরে থেকে যায়। দারিদ্র্য, জাতিগত পার্থক্য, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, লিঙ্গবৈষম্য এবং শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা তাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণকে কঠিন করে তোলে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-৪) "সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা" নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়। ভারতীয় শিক্ষানীতি (NEP ২০২০) অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে, যা সমাজের সব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই অধ্যায়ে সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক এবং বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত চাহিদা, সমস্যাসমূহ এবং তাদের জন্য কার্যকর শিক্ষণ-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৮.৩ সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ ও কৌশল

প্রান্তিককরণ এর ধারণা

সমাজে সকল শ্রেণির মানুষ সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করতে পারে না। অনেক মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য কারণে মূলধারার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনার ফলে তারা সমাজে এক ধরনের প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে, এই প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের যথাযথ সুযোগ ও সহায়তা না পেলে তাদের মানসিক, শারীরিক ও একাডেমিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

প্রান্তিককরণ কী?

প্রান্তিককরণ (Marginalization) হলো সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি ব্যাহত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে, প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা এমন একটি শ্রেণিতে পড়ে যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, লিঙ্গভিত্তিক বা শারীরিক কারণে শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রেণীকক্ষের প্রেক্ষাপটে প্রান্তিককরণ

একটি শ্রেণিকক্ষ সমাজের প্রতিচিত্র বহন করে, যেখানে বিভিন্ন পটভূমির শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে সকল শিক্ষার্থী একরকম সুবিধা পায় না। সমাজের কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হয়, যা তাদের শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য

- অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থী।
- জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী।
- লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থী, বিশেষ করে নারীরা।
- শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী।
- গ্রামীণ বা অনগ্রসর অঞ্চলের শিক্ষার্থী, যাদের কাছে উন্নত শিক্ষার সুযোগ সীমিত।
- নির্দিষ্ট সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থী।

প্রান্তিককরণের কারণসমূহ

শ্রেণীকক্ষে প্রান্তিককরণ ঘটে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো—

- **সামাজিক বৈষম্য**: কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, যেমন জাতিগত সংখ্যালঘু, নিম্নবর্ণের মানুষ বা ভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বৈষম্যের শিকার হয়।
- **অর্থনৈতিক দুর্বলতা**: দরিদ্র পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী, পোশাক, প্রযুক্তি বা গৃহশিক্ষকের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।
- **লিঙ্গ বৈষম্য**: অনেক সমাজে নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, যেমন— প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হলেও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার বেশি।
- **ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা**: মাতৃভাষার সাথে শিক্ষার ভাষার পার্থক্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা অনুভব করে।
- **বিশেষ শারীরিক বা মানসিক চাহিদা**: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষ পর্যাপ্ত সুযোগ ও সহায়তা দিতে ব্যর্থ হলে তারা পিছিয়ে পড়ে।
- **সাংস্কৃতিক ভিন্নতা**: সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা আলাদা আচরণ ও মূল্যবোধের কারণে একঘরে হয়ে যেতে পারে।

প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) করতে হলে শিক্ষকদের বিশেষ সচেতনতা ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন। এই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা মানে কেবল তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা নয়, বরং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এজন্য, শিক্ষাব্যবস্থায় সমতা আনয়ন, সংবেদনশীল শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেণীকক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থী

শ্রেণীকক্ষ শুধুমাত্র শেখার স্থান নয়, এটি একটি ক্ষুদ্র সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কিছু শিক্ষার্থী তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ে। তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় এবং তাদের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এই শিক্ষার্থীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থী বলা হয়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা

যেসব শিক্ষার্থী তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিগত পরিচয় বা অন্যান্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় না এবং বৈষম্যের সম্মুখীন হয়, তারা সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থী।

শ্রেণীকক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

- **অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পটভূমি**: দরিদ্র পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা পায় না।
- **ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা**: মাতৃভাষার সাথে শিক্ষার ভাষার পার্থক্যের কারণে তারা শিক্ষাক্রম বুঝতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- **জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত**: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে শ্রেণীকক্ষে বৈষম্যের শিকার হতে পারে।
- **লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার**: বিশেষ করে মেয়েরা অনেক সময় সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।
- **প্রবাসী বা অভিবাসী শিক্ষার্থী**: যারা বিভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের অভিবাসী শিক্ষার্থী, তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে শ্রেণীকক্ষে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়।
- **প্রথাগত সংস্কৃতির সাথে দ্বন্দ্ব** কিছু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার সাথে মানিয়ে নিতে পারলেও তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- **বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার**: অনেক সময় এই শিক্ষার্থীরা বুলিং বা অবজ্ঞার শিকার হয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে এবং শেখার আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

শ্রেণীকক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ

সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে—

- **পর্যাপ্ত শিক্ষাগত সহায়তা না পাওয়া**: এই শিক্ষার্থীরা প্রায়ই মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।
- **বৈষম্যমূলক মনোভাব**: শিক্ষক বা সহপাঠীদের বৈষম্যমূলক মনোভাব তাদের শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ কমিয়ে দিতে পারে।
- **ভাষাগত বাধা**: অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষার ভাষা ভালোভাবে বুঝতে না পারায় শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে না।
- **সামাজিক পরিচয়ের কারণে প্রত্যাখ্যাত হওয়া**: কিছু শিক্ষার্থী তাদের সামাজিক পরিচয়ের কারণে অবজ্ঞার শিকার হয়।
- **আত্মবিশ্বাসের অভাব**: বিভিন্ন বৈষম্যের কারণে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং একাডেমিক কাজে পিছিয়ে পড়ে।

শ্রেণীকক্ষে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার কৌশল

শ্রেণীকক্ষে এই শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ ও সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো তাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো—

- **ভাষাগত সহায়তা প্রদান**: শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান রেখে পাঠদান করা এবং সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা।
- **সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া**: বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য শ্রেণিকক্ষে তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান আচরণ করা।
- **ব্যক্তিগত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা**: বিশেষভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সহায়ক ক্লাস বা শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা।
- **বৈষম্যমূলক মনোভাব পরিবর্তন করা**: শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি না করেন।
- **সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান**: কাউন্সেলিং ও মানসিক সহায়তা প্রদান করে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো।
- **সহপাঠীদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা**: শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।
- **শিক্ষা উপকরণের বহুমুখিতা নিশ্চিত করা**: বহুভাষিক শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাকে সহজতর করা।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র তখনই কার্যকর হতে পারে যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্বিশেষে, শিক্ষার সমান সুযোগ পায়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের সংবেদনশীল আচরণ, বৈচিত্র্যময় শিক্ষা কৌশল ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে, তারা তাদের শিক্ষাজীবনে উন্নতি করতে পারবে এবং সমাজে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কৌশল

প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা সমাজের এমন একটি অংশ, যারা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা শারীরিক কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়, যাতে তারা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণীকক্ষ গঠনের জন্য শিক্ষকদের সংবেদনশীল হতে হবে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর শিক্ষা কৌশল

১. ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা প্রদান

- অনেক প্রান্তিক শিক্ষার্থী ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে যদি শিক্ষার মাধ্যম তাদের মাতৃভাষার বাইরে হয়।
- শিক্ষকদের উচিত সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পাঠদান করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিভাষিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।
- ভাষাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে কথোপকথনভিত্তিক ও গল্প বলার পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

২. শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে স্বীকৃতি দেওয়া

- শিক্ষা কৌশলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
- পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা উচিত, যাতে বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পায়।
- শ্রেণিকক্ষে উৎসব, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারলে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

৩. পারসোনালাইজড লার্নিং (ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি)

- প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্তর, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠদান করা।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও শক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে।
- শিক্ষকদের উচিত বিশেষ সহায়ক উপকরণ ও শেখার বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা, যেমন মাল্টিমিডিয়া টুলস ও ইন্টারেক্টিভ শিক্ষামূলক উপকরণ।

৪. সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান

- অনেক প্রান্তিক শিক্ষার্থী সামাজিক বৈষম্য ও মানসিক চাপে ভুগতে পারে, যা তাদের শিক্ষাজীবনে প্রভাব ফেলে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যাগুলো প্রকাশ করতে পারে।
- আত্মবিশ্বাস বাড়াতে শিক্ষার্থীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা ও উৎসাহ প্রদান জরুরি।

৫. পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা ও বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

- কিছু প্রান্তিক শিক্ষার্থীর জন্য প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি কার্যকর নাও হতে পারে।
- বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি, যেমন প্রকল্প-ভিত্তিক মূল্যায়ন, মৌখিক পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা যেতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের শেখার গতির ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা আনতে হবে, যাতে তারা তাদের নিজস্ব গতিতে শিখতে পারে।

৬. প্রযুক্তির ব্যবহার ও ডিজিটাল শিক্ষা

- মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।
- অনলাইন শিক্ষা উপকরণ, ই-ল্যাব এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট ব্যবহার করা গেলে অনেক শিক্ষার্থী সহজেই বিষয়বস্তু বুঝতে পারবে।

৭. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অভিভাবকদের সম্পৃক্তকরণ

- অনেক সময় অভিভাবকরাও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকায় তাদের শিশুদের পড়াশোনায় সঠিকভাবে সহায়তা করতে পারেন না।
- অভিভাবকদের সচেতন করতে প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যেতে পারে।
- পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা পেলে প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা আরও ভালোভাবে শিক্ষায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকদের সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং পাঠদানের কৌশলে বৈচিত্র্য আনতে হবে। ভাষাগত সহায়তা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও মানসিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব। পাশাপাশি, শ্রেণিকক্ষকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশে রূপান্তর করতে হবে, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমান সুযোগ পাবে এবং দক্ষতার সাথে তার একাডেমিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

৮.৪ শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী

শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এমন এক শ্রেণির শিক্ষার্থী, যারা শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সংবেদনশীল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং যাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি ও সহায়ক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করা হয় এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কৌশল

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাস, চলাফেরা এবং ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে।

২. ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি

- বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতি ও গতির পার্থক্য থাকতে পারে, তাই শিক্ষকদের তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে।
- অডিও, ভিজ্যুয়াল, স্পর্শনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী পার্সোনালাইজড লার্নিং পরিকল্পনা করা দরকার।

৩. সহায়ক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই, শ্রবণযন্ত্র, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার, ডিজিটাল লার্নিং টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শ্রবণ, দৃষ্টিশক্তি বা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।
- থেরাপিস্ট ও বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ রেখে শিক্ষণ পরিকল্পনা নির্ধারণ করা দরকার।

৪. বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

- নিয়মিত লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে মৌখিক, প্রকল্পভিত্তিক, বা পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সময় বা বিশেষ সহায়ক সরবরাহ করা উচিত।

৫. সামাজিক ও মানসিক সমর্থন

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে, তাই তাদের জন্য মানসিক কাউন্সেলিং ব্যবস্থা রাখা দরকার।
- তাদের দক্ষতা ও অর্জনকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে শ্রেণিকক্ষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে। তাদের শারীরিক, মানসিক ও একাডেমিক চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার, সহায়ক শিক্ষাদান কৌশল, এবং মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং তারা সমাজের মূলধারায় সফলভাবে যুক্ত হতে পারবে।

শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অর্থ

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বলতে এমন শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়, যারা শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সংবেদনশীল প্রতিবন্ধকতার কারণে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সমানভাবে অংশ নিতে সক্ষম নয়। তাদের শিখন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন হয়, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে নিশ্চিত করে।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা হলো এমন শিক্ষার্থীরা, যাদের নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সমান সুযোগ পায়।

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক কনভেনশন (UNCRPD) অনুযায়ী, **"প্রতিবন্ধিতা হলো এমন একটি শর্ত, যা ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সংবেদনশীল বা বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজের অন্যান্যদের মতো সমান সুযোগ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।"**

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ধরণ

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়, যা তাদের নির্দিষ্ট শিখন চাহিদা বোঝাতে সহায়ক:

- **শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী:** যারা শুনতে অক্ষম বা সীমিত মাত্রায় শুনতে পারে।
- **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী:** যারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে দেখতে অক্ষম।
- **বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী:** যাদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ধীর গতিতে হয়।
- **শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী:** যাদের চলাফেরায় শারীরিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হয়।
- **নিউরোডাইভারজেন্ট শিক্ষার্থী:** অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD), ডিসলেক্সিয়া, ADHD ইত্যাদির কারণে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ভিন্ন চাহিদা রয়েছে।
- **সাংবেদনশীল ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী:** যাদের আবেগীয় ও মানসিক সমস্যা রয়েছে, যা তাদের শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটায়।

শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব

শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

- **সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা:** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ না দিলে শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
- **সমান সুযোগ সৃষ্টি:** শিক্ষার মাধ্যমে তারা মূলধারার সমাজের অংশ হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।
- **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:** সহায়ক শিক্ষার মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের সক্ষমতা বিকাশ করতে পারে।
- **সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি:** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে অন্য শিক্ষার্থীদের মেলামেশার মাধ্যমে সমাজে সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

শ্রেণীকক্ষে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা একটি ন্যায়সংগত ও নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সহায়ক প্রযুক্তি, এবং সহপাঠীদের সহানুভূতি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে একটি সমান সুযোগ-নির্ভর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও নিজেদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হতে পারে।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষা

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিক্ষার্থীরা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শারীরিক ক্ষমতা বা অন্যান্য সংবেদনশীল সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ শিক্ষার ধারা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই, তাদের জন্য উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ, বিশেষ কৌশল এবং সহায়তামূলক উপকরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো—

- **তাদের স্বাভাবিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা** যাতে তারা মূলধারার শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।
- **সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা**, যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে।
- **সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা**, যাতে তারা সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।
- **জীবন দক্ষতা শেখানো**, যাতে তারা দৈনন্দিন জীবনে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।
- **বিশেষ সহায়তামূলক শিক্ষা কৌশল প্রয়োগ করা**, যাতে তাদের শিক্ষাগ্রহণ সহজ হয়।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ধরন

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়:

- **বিশেষ বিদ্যালয়:**
    1. সম্পূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মিত স্কুল যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক, সহায়ক প্রযুক্তি এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকে।
    2. যেমন: বধির ও দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা:**
    1. বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।
    2. সহপাঠীদের সাথে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
    3. অতিরিক্ত সহায়তা, যেমন বিশেষ শিক্ষক, ব্রেইল বই, অডিও ক্লাস, এবং সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকে।
- **বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষা:**

যেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার পরিবেশে থাকলেও তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা (যেমন: বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, থেরাপিস্ট, ও প্রযুক্তিগত সহায়তা) প্রদান করা হয়।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য কৌশল

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও উপায় অবলম্বন করা হয়, যেমন—

- **শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য:**
    - সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার।

    - শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (হিয়ারিং এইড) প্রদান।
    - শ্রবণশক্তি উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ।

- **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য:**
    - ব্রেইল বই, স্পর্শনির্ভর শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার।
    - অডিওবুক এবং স্পিচ-টু-টেক্সট প্রযুক্তি ব্যবহার।
    - শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে শিক্ষাকে সহজতর করা।

- **বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য:**
    - ধাপে ধাপে শেখানোর কৌশল ব্যবহার।
    - সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ভাষায় পাঠদান।
    - প্রতিদিনের কাজে যুক্ত করে শেখানোর ব্যবস্থা।

- **শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য:**
    - শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের জন্য হুইলচেয়ার সুবিধা রাখা।
    - বিশেষ কাস্টমাইজড ডেস্ক ও আসন ব্যবহার করা।
    - ডিজিটাল পাঠদান পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা।

- **সাংবেদনশীল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য:**
    - সংবেদনশীল আচরণ ও ধৈর্য সহকারে শিক্ষা প্রদান।
    - কাউন্সেলিং এবং থেরাপির ব্যবস্থা।
    - নিরাপদ ও মানসিকভাবে সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন—

- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব।
- প্রযুক্তিগত সুবিধার স্বল্পতা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা।
- পর্যাপ্ত পাঠ্য উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তির অভাব।

বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শুধুমাত্র মানবিক অধিকার নয়, এটি একটি সমাজের উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সঠিক কৌশল, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীদের যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই, শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা কোনো রকম বৈষম্য ছাড়াই তাদের শিক্ষাজীবন পরিচালনা করতে পারে এবং সমাজে সমানভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৮.৫ সারাংশ (Summary)

এই অধ্যায়ে সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক ও বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ, তাদের শিক্ষার চ্যালেঞ্জ এবং শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদানের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, যাতে কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৮.৬ স্ব-মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. সমাজ-সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব কী?

২. শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কীভাবে প্রভাব ফেলে?

৩. শ্রেণিকক্ষে ভাষাগত বৈচিত্র্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে?

৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকাগুলো কী কী?

৫. বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান?

৭. দৃষ্টিহীন ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষের উপযুক্ত পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?

৮. SDG-৪ লক্ষ্যের সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সম্পর্ক কী?

৯. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য কার্যকর শিক্ষণ-কৌশল কী কী?

১০. বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে?

৮.৭ তথ্যসূত্র

- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
- UNESCO (২০১৫). Education for All: Global Monitoring Report.
- National Education Policy (২০২০), Ministry of Education, Government of India.
- Tomlinson, C. A. (২০১৪). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. ASCD Publications.

একক ৯: লিঙ্গ একটি সামাজিক নির্মাণ; লিঙ্গভূমিকা, লিঙ্গ পক্ষপাত এবং শিক্ষাগত চর্চা (Gender as a Social Construct, Gender Role, Gender Bias, and Educational Practices)

৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১. লিঙ্গকে একটি সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিশ্লেষণ করা।

২. লিঙ্গভূমিকার ধারণা ব্যাখ্যা করা এবং এর সামাজিক প্রভাব বোঝানো।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত চিহ্নিত করা এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

৪. লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা।

৫. শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষার কৌশল উপস্থাপন করা।

৯.২ ভূমিকা (Introduction)

লিঙ্গ কেবলমাত্র জৈবিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত নয়, বরং এটি একটি সামাজিক নির্মাণ যা সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐতিহ্যের দ্বারা গঠিত হয়। সমাজ পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা, প্রত্যাশা এবং আচরণ নির্ধারণ করে, যা লিঙ্গভূমিকা হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত বিদ্যমান, যা শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, পেশাগত প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ-সংবেদনশীল নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP ২০২০) লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই অধ্যায়ে লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ, লিঙ্গভূমিকা, লিঙ্গ পক্ষপাত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার কৌশল বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

৯.৩ লিঙ্গ একটি সামাজিক নির্মাণ (Gender: A Social Construct)

জৈবিক লিঙ্গ (Sex) এর ধারণা

জৈবিক লিঙ্গ হলো একটি ব্যক্তির শরীরবৃত্তীয় ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত একটি প্রাকৃতিক বিষয়। এটি প্রধানত ক্রোমোজোম, হরমোন এবং প্রজনন অঙ্গের গঠনের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত, মানুষকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়—

1. **পুরুষ (Male):** যাদের XY ক্রোমোজোম থাকে এবং সাধারণত পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য থাকে।
2. **নারী (Female):** যাদের XX ক্রোমোজোম থাকে এবং নারীদের জন্য নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য থাকে।
3. **অন্তর্বর্তী বা আন্তঃলিঙ্গ (Intersex):** যাদের যৌনাঙ্গ, ক্রোমোজোম বা হরমোনগত বৈশিষ্ট্য নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ হতে পারে।

জৈবিক লিঙ্গ জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয় এবং এটি পরিবর্তন করা সাধারণত সম্ভব নয়।

সামাজিক লিঙ্গ (Gender) এর ধারণা (Concept of Gender)

সামাজিক লিঙ্গ (Gender) হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত ভূমিকা, আচরণ ও প্রত্যাশা, যা সমাজ পুরুষ ও নারীদের জন্য নির্ধারণ করে। এটি ব্যক্তির পরিচয় ও আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক লিঙ্গ প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে—

1. **সামাজিক প্রত্যাশা:** একজন পুরুষ বা নারীর প্রতি সমাজের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, যেমন—পুরুষদের শক্তিশালী ও স্বাধীন হিসেবে দেখা হয়, নারীদের যত্নশীল ও কোমল হিসেবে দেখা হয়।
2. **লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা:** সমাজে পুরুষ ও নারীর জন্য নির্ধারিত ভূমিকা ও দায়িত্ব, যেমন—পুরুষদের উপার্জনকারী এবং নারীদের গৃহস্থালি কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে দেখা।
3. **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য:** বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজে সামাজিক লিঙ্গের সংজ্ঞা ও ভূমিকা ভিন্ন হতে পারে।

সামাজিক লিঙ্গ পরিবর্তনযোগ্য এবং এটি সময়, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে লিঙ্গের একটি বিস্তৃত ধারণা গড়ে উঠেছে, যেখানে পুরুষ ও নারীর বাইরেও বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, যেমন—

- **ট্রান্সজেন্ডার:** যারা তাদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে সামঞ্জস্যবোধ করেন না।
- **নন-বাইনারি:** যারা নিজেদের নির্দিষ্টভাবে পুরুষ বা নারী হিসেবে পরিচয় দিতে চান না।

জৈবিক লিঙ্গ এবং সামাজিক লিঙ্গের পার্থক্য (Difference between Sex and Gender)

বৈশিষ্ট্য	জৈবিক লিঙ্গ (Sex)	সামাজিক লিঙ্গ (Gender)
সংজ্ঞা	শরীরবৃত্তীয় ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত	সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত ভূমিকা ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে গঠিত
উদ্ভব	জন্মগতভাবে নির্ধারিত	সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে গঠিত
বিভাগ	পুরুষ, নারী, অন্তর্বর্তী (Intersex)	পুরুষ, নারী, ট্রান্সজেন্ডার, নন-বাইনারি ইত্যাদি
পরিবর্তনযোগ্যতা	পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বা কঠিন	পরিবর্তনযোগ্য ও সামাজিকভাবে প্রভাবিত

লিঙ্গ শুধুমাত্র শারীরিক বা জৈবিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সামাজিক গঠন, যা নির্দিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গের এই দুটি মাত্রার পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ নিশ্চিত করতে এবং সামাজিক লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত কমাতে সাহায্য করে। বর্তমান সমাজে লিঙ্গ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হচ্ছে, যেখানে লিঙ্গ পরিচয়ের বহুমাত্রিকতা স্বীকৃতি পাচ্ছে, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৯. ৪ লিঙ্গ ভূমিকা (Gender Role)

লিঙ্গ কিভাবে সামাজিকভাবে নির্মিত হয়? (How Gender is Socially Constructed)

লিঙ্গভিত্তিক আচরণ ও প্রত্যাশা সমাজ বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করে—

- **পরিবার:** শৈশব থেকেই ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আচরণের শিক্ষা দেওয়া হয়।

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** পাঠ্যবই, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক ধারণা গড়ে ওঠে।

- **গণমাধ্যম:** সিনেমা, টিভি অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লিঙ্গভূমিকার প্রচার করা হয়।

- **ধর্ম ও সংস্কৃতি:** সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আদর্শ লিঙ্গভিত্তিক আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গভূমিকা ও এর প্রভাব (Role of Gender and its Influence)

লিঙ্গভূমিকার সংজ্ঞা: লিঙ্গভূমিকা হলো সমাজ নির্ধারিত ভূমিকা ও প্রত্যাশা যা পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথকভাবে নির্ধারিত হয়।

লিঙ্গভূমিকার উদাহরণ

- ছেলেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও সাহসী হিসেবে দেখা হয়, মেয়েদের নম্র ও যত্নশীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
- কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর কাজে উৎসাহিত করা হয়, মেয়েদের পরিচর্যা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হয়।
- পরিবারের মধ্যে পুরুষকে উপার্জনকারী এবং নারীদের গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব নেওয়ার প্রত্যাশা করা হয়।

লিঙ্গভূমিকার প্রভাব

- মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ কমে যেতে পারে।
- ছেলেদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, কারণ তাদের "শক্তিশালী" হতে হবে বলে শেখানো হয়।
- পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন তৈরি হয়।

৯. ৫ শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত ও বৈষম্য (Gender Bias and Gender Disparity in Education)

লিঙ্গ পক্ষপাত বা বৈষম্য হলো এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যেখানে নারী বা পুরুষের প্রতি সমাজের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি, সুযোগ, অধিকার এবং দায়িত্ব অসমভাবে বন্টিত হয়। এটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বহুমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। সাধারণত লিঙ্গ পক্ষপাতের ফলে নারীরা অধিকতর প্রভাবিত হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিও পক্ষপাতমূলক আচরণ দেখা যায়।

লিঙ্গ পক্ষপাতের সংজ্ঞা (Definition of Gender Bias)

লিঙ্গ পক্ষপাত বলতে বোঝায় এমন আচরণ, নীতি বা বিশ্বাস যা একজন ব্যক্তির প্রতি শুধুমাত্র তার লিঙ্গের ভিত্তিতে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ গঠনের কারণ হয়। এটি ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রকাশ পেতে পারে এবং নারীদের তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চনার শিকার হতে দেখা যায়। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে বোঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে নির্দিষ্ট লিঙ্গভুক্ত ব্যক্তিরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম সুযোগ, অধিকার, নিরাপত্তা বা সমর্থন পেয়ে থাকে।

লিঙ্গ পক্ষপাত ও বৈষম্যের ধরন (Types of Gender Bias and Gender Disparity)

১. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

- অনেক সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলোতে ছেলেদের শিক্ষার জন্য বেশি বিনিয়োগ করা হয়।
- পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়, যেখানে নারী চরিত্রগুলো গৃহস্থালি কাজের সাথে বেশি যুক্ত থাকে এবং পুরুষরা বাইরের জগতে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) বিষয়ে মেয়েদের কম আগ্রহী করার একটি সামাজিক প্রবণতা রয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কমিয়ে দেয়।

২. কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

- অনেক প্রতিষ্ঠানে পুরুষদের উচ্চ পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি বেশি দেওয়া হয়, যেখানে নারীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বের সুযোগ কম দেওয়া হয়।
- একই ধরনের কাজ করার পরও নারী ও পুরুষের মধ্যে বেতন বৈষম্য দেখা যায়, যা **wage gap** নামে পরিচিত।
- মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক কর্মক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা হয় এবং চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

৩. পারিবারিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

- অনেক পরিবারে নারীদের দায়িত্ব হিসেবে ঘরকন্নার কাজকে প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে পুরুষদের বাইরে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
- সন্তান প্রতিপালনেও লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ছেলেদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং মেয়েদের অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নারীদের মতামত অনেক সময় অবহেলা করা হয়।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

- কিছু সমাজে নারীদের পোশাক, চলাফেরা এবং আচরণের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যেখানে পুরুষদের জন্য এসব বাধ্যবাধকতা থাকে না।
- গণমাধ্যম ও বিনোদন শিল্পেও লিঙ্গ পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়, যেখানে নারীদের প্রধানত সৌন্দর্য ও বিনোদনের অবলম্বন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, এবং পুরুষদের শক্তিশালী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী চরিত্রে দেখানো হয়।

- খেলাধুলার ক্ষেত্রে নারীদের কম সুযোগ দেওয়া হয় এবং অনেক দেশে মেয়েদের খেলাধুলাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

৫. আইন ও নীতিতে লিঙ্গ পক্ষপাত

- কিছু দেশে এখনও নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আইনি বিধান রয়েছে, যা নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা সীমিত করে।
- পারিবারিক আইন ও সম্পত্তির আইনে অনেক সময় নারীদের তুলনামূলকভাবে কম অধিকার দেওয়া হয়।
- কিছু দেশে ভোটাধিকার, চাকরির সুযোগ ও মালিকানা অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন রয়েছে।

লিঙ্গ পক্ষপাতের কারণ Causes of Gender Bias)

লিঙ্গ পক্ষপাত বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে গড়ে ওঠে। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, পরিবারিক শিক্ষাদান পদ্ধতি, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং আইনি বিধিনিষেধ—এসব উপাদান লিঙ্গ পক্ষপাতকে প্রভাবিত করে। এই বৈষম্য শুধুমাত্র নারীদের জন্য নয়, কখনো কখনো পুরুষদের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। তাই লিঙ্গ পক্ষপাতের মূল কারণগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সমাজে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

(ক) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নারীদের গৃহস্থালি কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। এই ধরনের সমাজে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সীমিত থাকে।

(খ) লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ

শিশুরা জন্মের পর থেকে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ে বেড়ে ওঠে। মেয়েদের নম্রতা, বিনয় এবং পরিচর্যামূলক কাজ শেখানো হয়, যেখানে ছেলেদের শক্তিশালী, স্বাধীন ও নেতৃত্বমূলক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করা হয়।

(গ) ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি

বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস নারীদের তুলনামূলকভাবে পুরুষদের অধীনস্থ রাখার ধারণা তৈরি করতে পারে। কিছু ধর্মীয় অনুশাসন বা রীতিনীতি নারীদের পোশাক, চলাফেরা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

(ঘ) প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতিনীতি

অনেক সমাজে বিশ্বাস করা হয় যে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় দুর্বল এবং তারা উচ্চশিক্ষা বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মতো বিষয়ে কম দক্ষ। এই ভুল ধারণাগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লিঙ্গ পক্ষপাতকে টিকিয়ে রাখে।

২. শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা

(ক) পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ পক্ষপাত

অনেক পাঠ্যবইয়ে নারীদের ভূমিকা গৃহস্থালি কাজ ও যত্নশীলতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়, যেখানে পুরুষদের বিজ্ঞানী, নেতা বা উদ্ভাবক হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত শৈশব থেকেই গড়ে ওঠে।

(খ) শিক্ষকদের পক্ষপাতমূলক আচরণ

অনেক শিক্ষক অবচেতনভাবে ছেলেদের বেশি চ্যালেঞ্জিং কাজ দেন, যেখানে মেয়েদের নম্র ও বাধ্য হতে উৎসাহিত করেন। ফলে মেয়েদের আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে।

(গ) শিক্ষায় সুযোগের বৈষম্য

অনেক উন্নয়নশীল দেশে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম শিক্ষার সুযোগ পায়। দরিদ্র পরিবারগুলো সাধারণত ছেলেদের শিক্ষার জন্য বেশি বিনিয়োগ করে, কারণ তারা ভবিষ্যতে পরিবারের আয়-উপার্জনের প্রধান ব্যক্তি হবে বলে বিবেচিত হয়।

৩. অর্থনৈতিক কারণ

(ক) বেতন বৈষম্য

নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পান, যা লিঙ্গ পক্ষপাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় দুর্বল অবস্থানে থাকে।

(খ) চাকরির সুযোগের পার্থক্য

অনেক পেশায় নারীদের প্রবেশাধিকার সীমিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট পেশাগুলোতে নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

(গ) গৃহস্থালি ও বেতনহীন শ্রম

নারীরা পরিবারের ভেতরে যে গৃহস্থালি ও সন্তান লালন-পালনের কাজ করেন, তা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। ফলে তারা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

৪. আইনি ও রাজনৈতিক কারণ

(ক) নারীদের আইনি অধিকার সীমিত হওয়া

অনেক দেশে এখনো নারীদের সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ এবং মাতৃত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইন প্রচলিত রয়েছে। ফলে নারীরা পুরুষদের তুলনায় আইনি দিক থেকে দুর্বল অবস্থানে থাকে।

(খ) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব

রাজনীতিতে নারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ কম থাকায় নীতিগতভাবে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য কার্যকর আইন প্রণয়ন দেরিতে হয় বা উপেক্ষিত থাকে।

(গ) যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতা

নারীদের প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তাহীনতা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনকে ব্যাহত করে। কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন ও জনসাধারণের স্থানে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৫. গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ভূমিকা

(ক) মিডিয়ায় নারীর প্রতিনিধিত্ব

গণমাধ্যমে নারীদের সাধারণত গৃহস্থালি কাজ, শারীরিক সৌন্দর্য বা প্রেমমূলক সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে পুরুষদের বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী ও শক্তিশালী চরিত্রে দেখানো হয়।

(খ) বিজ্ঞাপন ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞাপনে নারীদের প্রধানত গৃহস্থালি পণ্য বা সৌন্দর্যসামগ্রীর মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে নারীদের ভূমিকা শুধুমাত্র গৃহস্থালি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা বাড়ে।

(গ) প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটে লিঙ্গ পক্ষপাত

প্রযুক্তি খাতেও লিঙ্গ পক্ষপাত বিদ্যমান। নারীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কম অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, যা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

লিঙ্গ পক্ষপাত একটি বহুমাত্রিক সমস্যা যা সমাজের গভীরে প্রোথিত। এটি পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত নানা উপাদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই বৈষম্য দূর করতে হলে শিক্ষা, আইন, অর্থনীতি এবং মিডিয়ায় সমতা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য লিঙ্গ সমতার প্রচার করা, নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করা এবং বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথা পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি।

লিঙ্গ পক্ষপাত দূর করার উপায় (Means of Eradicating Gender Bias)

লিঙ্গ পক্ষপাত দূর করতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- **শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা:**
  - পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
  - ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
- **কর্মক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নীতি গ্রহণ:**
  - সমান কাজের জন্য সমান বেতন নিশ্চিত করা।
  - মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটির সুযোগ দেওয়া।
- **গণমাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন:**
  - নারীকে কেবল গৃহস্থালি কাজের ভূমিকায় না দেখিয়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় উপস্থাপন করা।
  - লিঙ্গভিত্তিক স্টেরিওটাইপ এড়ানো।
- **আইন ও নীতিগত পরিবর্তন:**
  - লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন করা।
  - কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:**
  - নারীর অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
  - পরিবার ও সমাজে লিঙ্গ সমতা নিয়ে আলোচনা করা।

লিঙ্গ পক্ষপাত ও বৈষম্য একটি বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা যা ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক নীতিতে দৃশ্যমান। এটি নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক মানব উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিক্ষার প্রসার, আইনগত সংস্কার, সামাজিক সচেতনতা এবং রাজনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে লিঙ্গ পক্ষপাত কমিয়ে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব।

লিঙ্গ পক্ষপাতের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ (Major areas of Gender Bias)

লিঙ্গ পক্ষপাত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অসমতা তৈরি করে। এটি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনীতি এবং আইনি ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে প্রভাব ফেলে। লিঙ্গ পক্ষপাতের ফলে নারীরা সাধারণত বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তবে নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে পুরুষের প্রতিও বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হতে পারে।

১. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়, যা মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ হ্রাস করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ পেশাগত উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- **পাঠক্রমে লিঙ্গ পক্ষপাত:** অনেক পাঠ্যবইয়ে নারী চরিত্রকে গৃহস্থালি কাজের সাথে যুক্ত করা হয়, যেখানে পুরুষ চরিত্রকে বুদ্ধিমান, বিজ্ঞানী, নেতা বা কর্মজীবী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
- **বিষয় নির্বাচনে লিঙ্গভিত্তিক প্রবণতা:** বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) বিষয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়, যেখানে কলা, মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ে তারা বেশি আগ্রহী হয়।
- **শিক্ষকের আচরণ:** কিছু শিক্ষক অজান্তেই লিঙ্গ পক্ষপাতমূলক আচরণ করতে পারেন, যেমন—ছেলেদের বেশি কঠিন প্রশ্ন করা বা মেয়েদের নম্র ও বাধ্য হতে উৎসাহিত করা।
- **মেয়েদের স্কুলত্যাগ:** অনেক জায়গায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মেয়েদের স্কুল ছেড়ে দেওয়ার হার বেশি।

২. কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে এবং পুরুষদের ওপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব আরোপ করে, যা তাদের মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।

- **বেতন বৈষম্য:** সমান কাজ করার পরেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের কম বেতন দেওয়া হয়, যা **"Gender Wage Gap"** নামে পরিচিত।
- **কর্মস্থলে পদোন্নতি:** অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ অবস্থানে পুরুষদের সংখ্যা বেশি, এবং নারীদের পদোন্নতির সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে (**"Glass Ceiling Effect"**)।
- **পেশাগত ক্ষেত্রের বিভাজন:** নারীরা সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবামূলক পেশায় বেশি দেখা যায়, যেখানে প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও ব্যবসায়িক নেতৃত্বে পুরুষদের আধিপত্য বেশি।

- **মাতৃত্বজনিত বৈষম্য:** কর্মস্থলে গর্ভবতী নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা হয়, এবং অনেক সময় তাদের চাকরি হারানোর আশঙ্কা থাকে।

৩. পরিবার ও সামাজিক জীবনে লিঙ্গ পক্ষপাত

পরিবারের গঠন ও সামাজিক নিয়মাবলীতেও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

- **গৃহস্থালি কাজে বৈষম্য:** অধিকাংশ সমাজে গৃহস্থালি কাজ ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নারীদের ওপর বেশি বর্তায়, যেখানে পুরুষদের আয়মূলক কাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।
- **সন্তান প্রতিপালনে লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি:** ছেলেদের স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসী হতে শেখানো হয়, যেখানে মেয়েদের বাধ্য ও নম্র হতে উৎসাহিত করা হয়।
- **বিয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য:** অনেক সমাজে নারীদের বিয়ের জন্য সামাজিক ও পারিবারিক চাপ বেশি থাকে, যেখানে পুরুষদের জন্য এটি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিতে লিঙ্গ পক্ষপাত

নারীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়, যা তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

- **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য:** অনেক সমাজে পুরুষদের চিকিৎসা করানোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যা অবহেলিত হয়।
- **প্রজনন স্বাস্থ্য ও মাতৃসেবা:** কিছু দেশে নারীদের গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কম থাকে এবং মানসম্পন্ন মাতৃসেবা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়।
- **পুষ্টিতে বৈষম্য:** দরিদ্র পরিবারে সাধারণত ছেলেদের পুষ্টিকর খাবার বেশি দেওয়া হয়, যেখানে মেয়েরা কম পুষ্টিকর খাবার পেয়ে থাকে।

৫. আইন ও রাজনীতিতে লিঙ্গ পক্ষপাত

আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নারীদের ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

- **আইনগত অধিকার:** কিছু দেশে এখনো উত্তরাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, বিবাহবিচ্ছেদ, এবং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক আইন রয়েছে।
- **রাজনীতিতে নারীদের কম অংশগ্রহণ:** রাজনৈতিক পদে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- **নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনি দুর্বলতা:** অনেক দেশে যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর আইন ও প্রয়োগ ব্যবস্থা দুর্বল।

৬. গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গ পক্ষপাত

গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিতেও লিঙ্গ পক্ষপাত সুসংহত রয়েছে, যা সমাজে প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও দৃঢ় করে।

- **চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনে নারীর ভূমিকা:** নারীদের প্রধানত সৌন্দর্যের প্রতীক বা গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে পুরুষদের শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান চরিত্রে দেখানো হয়।
- **সংবাদ ও মিডিয়া কাভারেজ:** রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং খেলাধুলায় পুরুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেখানে নারীদের অর্জন কম প্রচার করা হয়।
- **নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি:** কিছু সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও প্রথা নারীদের অবদমিত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা লিঙ্গ বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখে।

লিঙ্গ পক্ষপাত একটি বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় সব স্তরে বিদ্যমান। এটি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। তবে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিগত পরিবর্তন, আইনি সংস্কার, শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে লিঙ্গ পক্ষপাত কমিয়ে একটি ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

লিঙ্গ এবং শিক্ষামূলক অনুশীলন (Gender and Educational Practices)

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বা পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়, যা নারীদের এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের সুযোগ সীমিত করে। শিক্ষামূলক অনুশীলনে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য শুধু পাঠ্যক্রমেই নয়, বরং শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়ন, স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষকের আচরণ এবং নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে লিঙ্গ এবং শিক্ষামূলক অনুশীলনের সম্পর্ক, চ্যালেঞ্জ, এবং সমাধানমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. লিঙ্গ এবং শিক্ষার সুযোগ

লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নারীদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তিদের শিক্ষার সুযোগ কমিয়ে দেয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নরূপ—

(ক) বিদ্যালয়ে ভর্তির হার

অনেক দেশে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় কম। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক কুসংস্কার এবং লিঙ্গভিত্তিক দায়িত্ববোধের কারণে মেয়েদের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়েই থেমে যায়।

(খ) বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের হার অনেক ক্ষেত্রে কম থাকে। বাল্যবিবাহ, পরিবারের কাজের চাপ, যৌন হয়রানি এবং নিরাপত্তাহীনতা তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে।

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষকদের পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব বাধা সৃষ্টি করে।

২. পাঠক্রম এবং পাঠ্যবইয়ে লিঙ্গ পক্ষপাত

শিক্ষার মান নির্ধারণে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক পাঠ্যবইয়ে নারীদের ভূমিকা গৃহস্থালি কাজ, সেবা পেশা বা পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, যেখানে পুরুষদের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত বা নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় উপস্থাপন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক আচরণ ও পেশা-বৈষম্য গড়ে ওঠে।

(ক) পাঠ্যসূচিতে নারীদের অবমূল্যায়ন

- ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিতে নারীদের অবদান কম তুলে ধরা হয়।
- নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের বেশিরভাগই পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়।

(খ) লিঙ্গ নিরপেক্ষ শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা

- পাঠ্যসূচিতে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করার জন্য নারী ও অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তিদের অবদান তুলে ধরতে হবে।
- লিঙ্গ সমতার জন্য শিক্ষাক্রমে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিষয়বস্তু যুক্ত করতে হবে।

৩. শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গভিত্তিক আচরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আচরণ, পাঠদানের কৌশল এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ পক্ষপাতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

(ক) শিক্ষকদের পক্ষপাত

- অনেক শিক্ষক অবচেতনভাবে ছেলেদের বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ দেন এবং তাদের থেকে উচ্চতর পারফরম্যান্স আশা করেন।
- মেয়েদের সাধারণত নীরব, বাধ্য এবং সহযোগী ভূমিকার জন্য প্রশংসা করা হয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।

(খ) লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল

- মেয়েদের এবং ছেলেদের জন্য ভিন্ন পাঠদানের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- মেয়েদের ক্ষেত্রে মৌখিক দক্ষতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে ছেলেদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করতে উৎসাহিত করা হয়।

(গ) শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গ নিরপেক্ষ পরিবেশ তৈরির প্রয়োজনীয়তা

- শিক্ষক প্রশিক্ষণে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত।

৪. মূল্যায়ন এবং শিক্ষাগত অগ্রগতিতে লিঙ্গ বৈষম্য

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও লিঙ্গ পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়, যা ভবিষ্যতে তাদের পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলে।

(ক) মূল্যায়নের ধরনে পক্ষপাত

- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ছেলেদের জন্য জটিল বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন বেশি দেওয়া হয়, যেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাষাগত বা সহজবোধ্য প্রশ্ন থাকে।

- গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক শিক্ষক মেয়েদের নম্রতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেন, যেখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(খ) উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত প্রবেশাধিকার

- ছেলেদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ সহজ হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও অর্থনৈতিক কারণের বাধা থাকে।
- প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম থাকে।

৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতি

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কার্যকর নীতি হলো—

(ক) লিঙ্গ সমতার জন্য নীতিমালা

- স্কুল ও কলেজের পরিবেশে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- লিঙ্গ সংবেদনশীল পাঠ্যক্রম উন্নয়ন করা দরকার।

(খ) যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতি

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর নিয়ম থাকা উচিত।
- শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

(গ) নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি

- নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে মেয়েদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ আরও অনুকূল করা যেতে পারে।

লিঙ্গ এবং শিক্ষামূলক অনুশীলনের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত দূর করতে হলে পাঠ্যসূচির উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। নারীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিতে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

৯. ৬ সারাংশ (Summary)

এই অধ্যায়ে লিঙ্গকে একটি সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লিঙ্গভূমিকা কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত বিদ্যমান থাকে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ সংবেদনশীল চর্চা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

৯.৭ স্ব-মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-evaluation questions)

১. লিঙ্গ কিভাবে সামাজিকভাবে নির্মিত হয়?

২. লিঙ্গভূমিকার উদাহরণ দিন এবং বিশ্লেষণ করুন।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত কীভাবে কাজ করে?

৪. শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

৫. পাঠক্রমে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল কী?

৬. লিঙ্গভূমিকা সামাজিক বৈষম্য কীভাবে তৈরি করে?

৭. শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষার কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

৯.৮ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Butler, J. (১৯৯০). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
- UNESCO (২০১৯). Gender Report on Education.
- National Education Policy (২০২০), Ministry of Education, Government of India.

ব্লক -৪ ভাষা, শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া, শিখন এবং সমালোচনামূলক চিন্তন (Language, Though Process of Learners, Learning and Critical Thinking)

একক ১০: ভাষা, শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া, শিখন ও সমালোচনামূলক চিন্তন (Language, Though Process of Learners, Learning and Critical Thinking)

১০.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাষার প্রকৃতি, গঠন এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ায় এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। ভাষা কেবলমাত্র ভাব প্রকাশের বাহন নয়, বরং এটি মানব মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনা, জ্ঞানার্জন, এবং যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। একজন শিক্ষার্থী যখন ভাষা আয়ত্ত করে, তখন সে কেবল নতুন শব্দ ও বাক্য গঠন শেখে না, বরং তার চিন্তাধারা সংগঠিত হয়, বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকশিত হয়। তাই ভাষাগত দক্ষতা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০.২ ভূমিকা (Introduction)

ভাষা মানব সভ্যতার ভিত্তি। এটি মানুষকে ভাব বিনিময়, জ্ঞান সংরক্ষণ, এবং নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ করে দেয়। প্রতিটি সংস্কৃতি ও সমাজের নিজস্ব ভাষাগত কাঠামো থাকে, যা তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ভাষা ছাড়া মানুষের চিন্তার প্রকাশ সম্ভব নয়, কারণ ভাষাই চিন্তার বাহন। ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং ধারণাগুলি প্রকাশ করতে পারে, যা শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শিশু যখন শিক্ষালাভ শুরু করে, তখন তার শেখার মাধ্যম ভাষা। শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষে আলোচনার ধরন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র—সবকিছুই ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতা যত উন্নত হবে, তার শেখার ক্ষমতা তত বেশি হবে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাগত কাঠামো বোঝা, তার ব্যবহারিক দিক অনুধাবন করা এবং বাস্তব জীবনে এর কার্যকারিতা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা শেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তথ্য গ্রহণ ও প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করে না, বরং তার সৃজনশীলতা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ ঘটে।

১০.৩ ভাষা (Language)

ভাষার প্রকৃতি ও গঠন

ভাষা একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গঠনের অংশ, যা নির্দিষ্ট নিয়ম ও কাঠামোর মাধ্যমে গঠিত। ভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonetic), শব্দতাত্ত্বিক (morphological), বাক্যতাত্ত্বিক (syntactic) এবং অর্থবহ (semantic) কাঠামো রয়েছে, যা এর ব্যবহারের নিয়ম নির্ধারণ করে। নোয়াম চমস্কির (Noam Chomsky) "Universal Grammar" ধারণা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সহজাত। চমস্কির মতে, প্রতিটি শিশুর মধ্যে একটি স্বাভাবিক ভাষাগত কাঠামো বিদ্যমান, যা তাকে তার চারপাশের ভাষা দ্রুত শিখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, শিশুরা কেবল ভাষার শব্দ ও বাক্য গঠনের নিয়ম মুখস্থ করে না, বরং তাদের মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাষার গঠন ও ব্যবহার শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেভ ভাইগটস্কির(Lev Vygotsky) "Social Interaction Theory" ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। তার

মতে, শিশুরা ভাষা শেখে মূলত তাদের চারপাশের মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠীদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে শিশুর ভাষা শেখার দক্ষতা বিকশিত হয়। ভিগোৎস্কি "Zone of Proximal Development (ZPD)" ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে শিশুরা তখনই ভালোভাবে শেখে, যখন তারা অন্যদের সাহায্য ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জিং কাজ সম্পাদন করতে পারে।

ভাষার প্রধান উপাদান (Components of Language)

ভাষা একটি বহুমাত্রিক কাঠামো, যার বিভিন্ন উপাদান একত্রে ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি করে। ভাষার প্রধান চারটি উপাদান হলো—

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics): এটি ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব উচ্চারণের নিয়ম রয়েছে, যা ধ্বনিতত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়।

২. শব্দতত্ত্ব (Morphology): শব্দ গঠনের নিয়ম ও কাঠামো শব্দতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। শব্দ কীভাবে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সংযোগে নতুন শব্দ কীভাবে তৈরি হয়, তা শব্দতত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়।

৩. বাক্যতত্ত্ব (Syntax): বাক্যতত্ত্ব নির্ধারণ করে যে একটি বাক্যে শব্দ কীভাবে সাজানো হবে এবং বাক্যের গঠন কেমন হবে। এটি ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামো ব্যাখ্যা করে।

৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics): অর্থতত্ত্ব ভাষার শব্দ ও বাক্যের অর্থ নির্ধারণ করে। একই শব্দ বা বাক্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে, যা ভাষার অর্থগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা (Role of Language in Education)

শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ায় ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। ভাষা ছাড়া জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়, কারণ ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান গঠিত ও সংরক্ষিত হয়। ভাষাগত দক্ষতা উন্নত হলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবস্তুর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে এবং তথ্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা অর্জন করে।

দ্বিভাষিকতা ও শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা (Bilingualism and Learning ability of the Learners)

দ্বিভাষিকতা (Bilingualism) বা একাধিক ভাষায় দক্ষতা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও সমৃদ্ধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে দ্বিভাষিক শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের নমনীয়তা (Cognitive Flexibility) বেশি হয় এবং তারা নতুন তথ্য গ্রহণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অধিক সক্ষম হয়। দ্বিভাষিক শিক্ষার্থীরা ভাষাগত তুলনা করতে পারে, যা তাদের বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতার প্রভাব বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। যারা দুটি বা ততোধিক ভাষায় দক্ষ, তারা একাধিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং তাদের যোগাযোগ দক্ষতা আরও উন্নত হয়। এটি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০.৪ শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া (Thought Process of Learners)

চিন্তন প্রক্রিয়া হল তথ্য গ্রহণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগের একটি মানসিক কার্যক্রম। শিশুরা পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, সেটি

তাদের পূর্ববর্তী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং নতুন ধারণা তৈরি করে। শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, যা পিয়াজের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশ তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়।

শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Thought Process of Learners)

- **তথ্য গ্রহণ ও বিশ্লেষণ**: শিশু নতুন তথ্য গ্রহণ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করে।
- **যুক্তিকরণ ও সমস্যার সমাধান**: শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাশক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজে।
- **সৃজনশীল চিন্তা**: শিশুরা নতুন ধারণা তৈরি করতে এবং উদ্ভাবনী উপায়ে সমাধান খুঁজতে সক্ষম হয়।
- **আবেগ ও অভিজ্ঞতার সংযোগ**: চিন্তন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করে না, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগও এতে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এমন কয়েকটি বিষয় (Factors Affecting Thought Process of the Learners)

- ব্যক্তিগত আগ্রহ ও জ্ঞান
- ভাষাগত দক্ষতা
- পরিবেশ ও সামাজিক যোগাযোগ
- শিক্ষকের ভূমিকা ও পাঠদান কৌশল

১০.৫ শিখন এবং সমালোচনামূলক চিন্তা (Learning and Critical Thinking)

শিখন হলো অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের একটি ধাপে ধাপে বিকাশমান প্রক্রিয়া। এটি ভাষা এবং চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। সমালোচনামূলক চিন্তা হল শিক্ষার্থীদের শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা তাদের যুক্তিবাদী চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

শিখনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning)

- অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখা
- পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন
- পূর্ববর্তী জ্ঞানের সঙ্গে নতুন ধারণার সংযোগ স্থাপন
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক

সমালোচনামূলক চিন্তার গুরুত্ব (Importance of critical Thinking)

- শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তক হিসেবে গড়ে তোলে

- যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে
- বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বাড়ায়
- সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়

১০.৬ সারাংশ (Summary)

শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক চিন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার স্বাধীনতা দেওয়া, তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো, প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা । এই এককে ভাষার প্রকৃতি, গঠন, শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া এবং শিখনের উপর ভাষার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভাষা কেবলমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি চিন্তাভাবনা, জ্ঞানার্জন এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখার মাধ্যমে কেবল শব্দ ও বাক্য গঠন শেখে না, বরং তাদের সমালোচনামূলক চিন্তা এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের দক্ষতা বাড়ে। নোয়াম চমস্কির "Universal Grammar" এবং লেভ ভাইগটস্কির "Social Interaction Theory" ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে বিকশিত হয় এবং এটি তাদের ভাষাগত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। দ্বিভাষিকতা শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও সমৃদ্ধ করে, কারণ এটি তাদের মস্তিষ্কের নমনীয়তা বৃদ্ধি করে এবং সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ ঘটায়। শিখন হলো অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান অর্জনের একটি ধাপে ধাপে বিকাশমান প্রক্রিয়া। সমালোচনামূলক চিন্তা শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী চিন্তা, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দক্ষতা উন্নত করা, প্রশ্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং যুক্তিবাদী চিন্তা বিকাশে সহায়তা করা ।

১০.৭ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation questions)

১. ভাষার প্রধান উপাদান গুলি কি কি?

২. শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা আলোচনা কর।

৩. দ্বিভাষিকতা কি?

৪. শিক্ষার্থীদের চিন্তান প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ ।

৫. শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়া কে প্রভাবিত করে এমন বিষয় গুলির উল্লেখ করো ।

১০. ৮ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Chomsky, N. (১৯৬৫). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Piaget, J. (১৯৫২). *The Origins of Intelligence in Children*. W.W. Norton & Company.

- Cummins, J. (২০০০). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Multilingual Matters.
- Krashen, S. (১৯৮২). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon Press.

একক ১১: শিশুদের কৌশল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Learning Process through Children's Strategies: Social Context and Social Activities)

১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হলো শিশুদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা, যেখানে তাদের কৌশল, সামাজিক পরিবেশ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করা হবে। শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতা কেবল তাদের নিজস্ব কৌশলের ওপর নির্ভর করে না, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ তত্ত্ব, পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং শিক্ষার পরিবেষ্টিত (contextual) প্রকৃতিকে গভীরভাবে বুঝতে পারবে।

১১.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষণ প্রক্রিয়া শুধু শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়। শিশুরা জন্মগতভাবেই শেখার ক্ষমতা নিয়ে আসে, তবে তাদের শেখার ধরণ গঠিত হয় তাদের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতা, এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। পিঁয়াজে, ভাইগটস্কি এবং বান্দুরার শিক্ষণ তত্ত্বগুলো শিশুদের শেখার বৈচিত্র্যময় রূপ ব্যাখ্যা করে। পিঁয়াজের কনস্ট্রাক্টিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলছে, শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান গঠন করে, যা ক্রমাগত উন্নতি লাভ করে। ভাইগটস্কির সামাজিক নির্মাণবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী, শেখা হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং এটি পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভরশীল। বান্দুরার পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে শিশুরা অনুকরণের মাধ্যমে শেখে এবং তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে আচরণ পরিবর্তন করে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি শিশুর কৌশল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং কার্যক্রমের সমন্বিত ফলাফল।

১১.৩ শিশুদের কৌশল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Learning Process through Children's Strategies: Social Context and Social Activities)

শিশুরা বিভিন্ন উপায়ে শেখে, যা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রধান উপাদান সক্রিয় থাকে—

১. শিশুদের শেখার কৌশল (Learning Strategies of Children)

শিশুরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শেখে, যা তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ: শিশুরা তাদের চারপাশের মানুষকে অনুসরণ করে শেখে। বান্দুরার সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব অনুসারে, শিশুরা তাদের শিক্ষকদের, অভিভাবকদের বা সমবয়সীদের আচরণ অনুকরণ করে নতুন দক্ষতা অর্জন করে।

আবিষ্কারমূলক শিক্ষণ: শিশুরা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শেখে। পিঁয়াজের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে শিশুরা ধাপে ধাপে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান নির্মাণ করে।

সহযোগিতামূলক শিক্ষণ: ভাইগটস্কির "Zone of Proximal Development" ধারণা ব্যাখ্যা করে যে শিশুরা সহপাঠীদের সাহায্যে আরও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষণ: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা নিয়ম মানা, সামাজিক আচরণ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতা শেখে।

২. সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা

শিশুর শিক্ষণ পরিবেষ্টিত সামাজিক পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব: ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান এবং পারিবারিক কাঠামো শিশুর শেখার ধরনকে প্রভাবিত করে। ভাইগটস্কির মতে, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি।

পরিবারের ভূমিকা: শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হলো তার পরিবার। পারিবারিক মূল্যবোধ, কথোপকথন এবং নিয়ম শিশুর ভাষা শেখা ও সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের ভূমিকা: বিদ্যালয় শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থান। শিক্ষকরা শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করেন না, বরং শেখার উপযোগী পরিবেশও তৈরি করেন।

বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের ভূমিকা: শিশুদের বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীরা তাদের শেখার গতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধান এবং নতুন ধারণা গঠনের দক্ষতা অর্জন করে।

৩. সামাজিক কার্যক্রম ও শিক্ষণ

শিশুরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

দলগত কাজ ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ: বিদ্যালয়ে শিশুরা দলগতভাবে কাজ করে, যা তাদের যৌথ চিন্তাধারা গঠনে সহায়তা করে।

সাংস্কৃতিক উৎসব ও কার্যক্রম: শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম যেমন নাটক, গান, আবৃত্তি ও বিতর্ক শিক্ষণকে গতিশীল করে।

সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষণ: শিশুরা যখন সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রমে অংশ নেয়, তখন তারা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সাথে নিজেদের জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে পারে।

১১.৪ সারাংশ (Summary)

শিশুর শিক্ষণ প্রক্রিয়া মূলত তাদের কৌশল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক কার্যক্রমের সংমিশ্রণ। পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ, সমস্যা সমাধান এবং দলগত কাজে অংশগ্রহণ শিশুদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে। ভাইগটস্কি, বান্দুরা ও পিঁয়াজের তত্ত্বগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষণ একটি অন্তর্নির্মিত ও পরিবেষ্টিত প্রক্রিয়া, যা শিশুর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, পারিবারিক পরিবেশ, বিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১১.৫ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation questions)

১. ভাইগটস্কির "Zone of Proximal Development" কী এবং এটি শিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

২. বান্দুরার পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ তত্ত্ব কীভাবে শিশুর আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে?

৩. পিঁয়াজের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট তত্ত্ব শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে কীভাবে কার্যকর?

৪. সামাজিক প্রেক্ষাপট শিশুর শেখার প্রক্রিয়ায় কীভাবে ভূমিকা রাখে?

৫. বিদ্যালয়ের দলগত কার্যক্রম শিশুর শেখার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে?

১১.৬ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Bandura,A.(১৯৭৭).SocialLearningTheory.Prentice-Hall.
- Piaget,J.(১৯৫২).TheOriginsofIntelligenceinChildren.Norton.
- Vygotsky,L.S.(১৯৭৮).MindinSociety:TheDevelopmentofHigherPsychologicalProcesses.HarvardUniversityPress.

একক ১২: শিক্ষার বিকল্প ধারণা: শিশু একজন সমস্যা সমাধানকারী ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী (Alternative Conception of Learning: Child as a Problem Solver and Scientific Investigator)

১২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে বিকল্প শিক্ষণ তত্ত্বগুলোর বিশ্লেষণ করা এবং শিশুকে একজন সক্রিয় সমস্যা সমাধানকারী ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী হিসেবে উপস্থাপন করা। এতে শিক্ষার্থীরা:

- শিক্ষার বিকল্প ধারণাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিশুরা কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে শেখে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিশুর বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানী মনোভাব বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝতে পারবে।
- বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান দক্ষতা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা জানতে পারবে।

১২.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রথাগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যেখানে শিক্ষক শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ করেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলো মুখস্থ করে। তবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলছে, শিক্ষার প্রকৃতি কেবল তথ্য গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া। শিশুরা জন্মগতভাবে কৌতূহলী। তারা আশপাশের জগতকে অন্বেষণ করতে ভালোবাসে, প্রশ্ন করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং তাদের নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করে। ফলে, শিশুকে শুধুমাত্র একজন জ্ঞানগ্রাহী হিসেবে নয়, বরং একজন সমস্যা সমাধানকারী ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষার বিকল্প ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কনস্ট্রাক্টিভিজম, সমস্যা ভিত্তিক শিক্ষণ (Problem-Based Learning - PBL), অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণ (Inquiry-Based Learning), এবং আবিষ্কারমূলক শিক্ষণ (Discovery Learning)।

এই সবগুলো ধারণাই শিশুদের সক্রিয় চিন্তক ও সমাধানকারী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়।

১২.৩ শিক্ষার বিকল্প ধারণা: শিশু একজন সমস্যা সমাধানকারী ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী (Alternative Conception of Learning: Child as a Problem Solver and Scientific Investigator)

১. শিক্ষার বিকল্প ধারণা (Alternative Concepts of Education)

শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেল থেকে সরে এসে বিকল্প শিক্ষার ধারণাগুলি শিশুর স্বাভাবিক অনুসন্ধানী ও সমস্যা সমাধান দক্ষতাকে উৎসাহিত করে।

নির্মিতিবাদ শিক্ষণ (Constructivist Learning): পিঁয়াজের মতানুসারে শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান গঠন করে। তারা শুধু তথ্য গ্রহণ করে না, বরং নিজেদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববর্তী জ্ঞানের সঙ্গে নতুন তথ্য একত্রিত করে অর্থবহ শিক্ষণ ঘটায়।

সমস্যাভিত্তিক শিক্ষণ (Problem-Based Learning - PBL): এখানে শিশুদের বাস্তবসম্মত সমস্যা প্রদান করা হয়, যা সমাধানের মাধ্যমে তারা শেখে।

অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণ (Inquiry-Based Learning): শিশুদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয় এবং তারা পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তর খুঁজে বের করে।

আবিষ্কারমূলক শিক্ষণ (Discovery Learning): বান্দুরা ও ব্রুনারের মতে, শিশুরা সক্রিয়ভাবে নতুন ধারণা আবিষ্কার করে এবং সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা শিক্ষণ সম্পন্ন করে।

২. শিশু একজন সমস্যা সমাধানকারী (Child as a Problem solver)

প্রতিদিনের জীবনে শিশুরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চায়।

সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical Thinking): শিশুরা তাদের চারপাশের ঘটনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে।

স্বনির্ভর সমস্যা সমাধান (Independent Problem Solving): শিশুরা নিজেরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।

সৃজনশীল চিন্তা (Creative Thinking): সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন উপায় বের করার ক্ষমতা শিশুদের মধ্যে জন্মগতভাবে থাকে।

৩. শিশু একজন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী (Child as Scientific Investigator)

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেবল প্রাপ্তবয়স্ক গবেষকদের জন্য সীমিত নয়। শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই ছোট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী।

পর্যবেক্ষণ (Observation): শিশুরা তাদের চারপাশের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Experimentation): শিশুরা নতুন ধারণা তৈরি করতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত (Evidence-Based Decision Making): শিশুরা পরীক্ষার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে।

শিশুদের বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে কৌতূহল উদ্দীপক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে তারা প্রশ্ন করতে পারবে, ত্রুটি করতে পারবে, এবং নতুন জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাবে।

১২.৪ সারাংশ (Summary)

শিশুদের শিক্ষার প্রচলিত মডেল থেকে বেরিয়ে এসে, তাদের সমস্যা সমাধানকারী ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিকল্প শিক্ষার ধারণাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কনস্ট্রাক্টিভিজম, PBL, অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণ, এবং আবিষ্কারমূলক শিক্ষণের মাধ্যমে শিশুরা সক্রিয় চিন্তক হয়ে ওঠে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্যার সমাধান করতে শেখে, সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তা গড়ে তোলে, এবং বাস্তব জীবনের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। ফলে, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধানী, ও কার্যকর সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে তৈরি করা।

১২.৫ স্ব মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. শিক্ষার বিকল্প ধারণাগুলি কীভাবে শিশুকে সমস্যা সমাধান ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী করে গড়ে তোলে?

২. কনস্ট্রাক্টিভিস্ট শিক্ষণ ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. বান্দুরার সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব শিশুর অনুসন্ধানমূলক শিক্ষণে কীভাবে সাহায্য করে?

৪. PBL-এর মূল উপাদান কী এবং এটি বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে কীভাবে কার্যকর?

৫. শিশুদের বিজ্ঞানমনস্কতা কীভাবে বিকাশ করা যায়?

১২.৬ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Bruner, J. (১৯৬১). The Process of Education. Harvard University Press.
- Piaget, J. (১৯৫২). The Origins of Intelligence in Children. Norton.
- Bandura, A. (১৯৭৭). Social Learning Theory. Prentice-Hall.
- Vygotsky, L. S. (১৯৭৮). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

ব্লক ৫: শিক্ষণ, শেখা ও মূল্যায়ন (Teaching, Learning and assessmenT

একক ১৩: শিক্ষণ ও শেখার উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ: ব্যক্তিগত উপাদান (জ্ঞানগত, আবেগগত, প্রেষণামূলক) ও পরিবেশগত উপাদান (Factors Contributing Teahing-Learning: Personal (Cognition, Emotion, Motivation) and Environmental

১৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১. শিক্ষণ ও শেখার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উপাদানসমূহ (জ্ঞান, আবেগ ও প্রেরণা) বোঝা।

২. পরিবেশগত উপাদানসমূহ কীভাবে শেখার কার্যকারিতা বাড়াতে পারে তা বিশ্লেষণ করা।

৩. শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উপাদানগুলোর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৩.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষণ ও শেখা (Teaching and Learning) একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই উপাদানগুলো শিক্ষার্থীর জ্ঞান, আবেগ, প্রেরণা, এবং শিক্ষার পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সফল শিক্ষণ কেবলমাত্র শিক্ষকের পাঠদানের ওপর নির্ভর করে না, বরং শিক্ষার্থী কীভাবে তথ্য গ্রহণ করে, প্রক্রিয়াকরণ করে এবং প্রয়োগ করে, তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর শেখার ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন—তার চিন্তা করার দক্ষতা (Cognition), আবেগগত অবস্থা (Emotion), এবং শেখার প্রতি আগ্রহ বা প্রেরণা (Motivation)। একটি অনুকূল পরিবেশ থাকলে শিক্ষার্থীরা সহজে নতুন ধারণা গ্রহণ করতে পারে এবং শেখার অভিজ্ঞতা আরও কার্যকর হয়।অন্যদিকে, শেখার ক্ষেত্রে পরিবেশগত উপাদানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত করতে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, পারিবারিক সহায়তা, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষকের পাঠদানের কৌশল প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী এমন একটি পরিবারে বড় হয় যেখানে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে সে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলবে। আবার, শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি ও সহায়ক আচরণ শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে বাড়াতে পারে।বর্তমান যুগে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে শিক্ষণ ও শেখার কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ডিজিটাল শিক্ষামাধ্যম, ইন্টারনেট, এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তবে শিক্ষণ ও শেখার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তি ও পরিবেশগত উভয় উপাদানের ভূমিকা বুঝতে হবে এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।এই আলোচনায় আমরা শিক্ষণ ও শেখার ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত উপাদানসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করব এবং কীভাবে এগুলো শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করব।

১৩.৩ ব্যক্তিগত উপাদান (Personal Factors)

১৩.৩.১ জ্ঞানগত উপাদান (Cognition)

শিক্ষার ক্ষেত্রে কগনিশন বা জ্ঞানগত দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শিক্ষার্থীর চিন্তা করার ক্ষমতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, এবং শেখার কৌশলের উপর নির্ভর করে।

- ✅ **পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা** – শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী শেখার অভিজ্ঞতা নতুন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ✅ **মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি** – শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তির উপর।
- ✅ **মেটাকগনিশন (Metacognition)** – শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে, তা বোঝার দক্ষতা তাদের শেখার কৌশলকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।
- ✅ **সমস্যা সমাধানের দক্ষতা** – শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তাকে কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

১৩.৩.২ আবেগগত উপাদান (Emotion)

শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর আবেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক আবেগ শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, আর নেতিবাচক আবেগ শেখার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

- ✅ **আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ** – শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান থাকলে সে নতুন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়।
- ✅ **উদ্বেগ ও মানসিক চাপ** – পরীক্ষার চাপ বা ভয় শিক্ষার্থীর শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।
- ✅ **শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক** – শিক্ষকের উৎসাহ ও সহানুভূতি শিক্ষার্থীর শেখার মান বাড়াতে সাহায্য করে।
- ✅ **সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক** – বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে।

১৩.৩.৩ প্রেষণা (Motivation)

শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ।

- ✅ **অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Intrinsic Motivation)** – নিজস্ব কৌতূহল, জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত উন্নতির ইচ্ছা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
- ✅ **বাহ্যিক প্রেষণা (Extrinsic Motivation)** – পুরস্কার, স্বীকৃতি, প্রতিযোগিতা বা বাহ্যিক চাপের কারণে শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

- ✅ **লক্ষ্য স্থিরকরণ** – নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে শিক্ষার্থীরা শেখার প্রতি আরও মনোযোগী হয়।
- ✅ **সফলতার প্রত্যাশা** – শিক্ষার্থী যদি তার প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়, তবে তার শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১৩.৪ পরিবেশগত উপাদান (Environmental Factors)

১৩.৪.১ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ

- ✅ **শিক্ষকের পাঠদানের কৌশল** – শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল শেখার গতি ও মান নির্ধারণ করে।
- ✅ **শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ** – ইতিবাচক ও সমর্থনমূলক পরিবেশ শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
- ✅ **প্রযুক্তির ব্যবহার** – মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারে।

১৩.৪.২ পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব

- ✅ **পরিবারের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি** – পরিবারের সমর্থন থাকলে শিক্ষার্থী শেখার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হয়।
- ✅ **অভিভাবকদের সহায়তা** – বাবা-মায়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহকে প্রভাবিত করে।
- ✅ **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব** – সমাজের মূল্যবোধ, বন্ধুবান্ধব, এবং সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর শেখার মান নির্ধারণ করে।

১৩.৪.৩ অর্থনৈতিক ও ভৌত পরিবেশ

- ✅ **বিদ্যালয়ের অবকাঠামো** – সুপরিকল্পিত শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার উপকরণ শেখার মানোন্নয়ন করে।
- ✅ **অর্থনৈতিক অবস্থা** – পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা শিক্ষার সুযোগ ও মানের উপর প্রভাব ফেলে।
- ✅ **নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ** – মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা শিক্ষার্থীর শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

১৩.৫ সারাংশ (Summary)

শিক্ষণ ও শেখার উপর ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিগত উপাদানগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীর **জ্ঞানগত (Cognition)** দক্ষতা, **আবেগগত (Emotion)** অবস্থা, এবং **প্রেরণা (Motivation)** উল্লেখযোগ্য।

- ✅ **জ্ঞানগত দক্ষতা (Cognition)** শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং পূর্বজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

✅ **আবেগগত উপাদান (Emotion)** শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, মানসিক চাপ, এবং শেখার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

✅ **প্রেষণা (Motivation)** শেখার প্রতি শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে।

অন্যদিকে, শিক্ষার পরিবেশও শিক্ষার্থীর শেখার মান নির্ধারণ করে।

✅ **শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ** যদি অনুকূল হয়, তবে শিক্ষার্থীরা বেশি মনোযোগী হয় এবং শেখার প্রতি আগ্রহী থাকে।

✅ **পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব** শিক্ষার্থীর শেখার মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করে।

✅ **অর্থনৈতিক ও ভৌত পরিবেশ** শিক্ষার সুযোগ ও মান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উপাদানগুলোর সমন্বিত প্রভাব শিক্ষার সফলতার জন্য অপরিহার্য। যদি শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক আবেগ, উচ্চ প্রেরণা এবং দক্ষ জ্ঞানগত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং যদি তারা অনুকূল পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তাহলে তাদের শেখার অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হবে। তাই, শিক্ষণ ও শেখার কার্যকারিতা বাড়াতে হলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। 😊

১৩.৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation Questions)

১. শিক্ষার্থীর শেখার উপর প্রজ্ঞার (Cognition) কী প্রভাব পড়ে?

২. আবেগগত উপাদান কীভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে?

৩. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রেরণার মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ শেখার মান উন্নত করতে কীভাবে সাহায্য করে?

৫. পারিবারিক ও সামাজিক উপাদান শিক্ষার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে?

৬. শেখার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার ভূমিকা কী?

১৩.৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Mayer, R. E. (২০০৯). Multimedia learning. Cambridge University Press.
- NEP. (২০২০). National Education Policy ২০২০. Ministry of Education, Government of India.
- Sahlberg, P. (২০১১). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press.
- Tomlinson, C. A. (২০০১). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD.

একক ১৪: শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য বহুভাষিক সম্পদ, এবং প্রতিকারমূলক শিক্ষণ (Teaching-Learning Materials: textbooks, Multimedia, Multilingual Resources of the Classroom and Remedial Teaching)

১৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১. শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩. মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার কীভাবে শিক্ষাকে আরও কার্যকর করে তা বুঝতে পারবে ।

৪. শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক সম্পদের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে ।

৫. প্রতিকারমূলক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

১৪.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, তবে বর্তমান সময়ে শিক্ষার কৌশল ও চাহিদার পরিবর্তনের ফলে শিক্ষণ উপকরণের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে । শিক্ষকের পাঠদান প্রক্রিয়া যেমন শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি কার্যকর শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহার শেখার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে । অতীতে শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণ প্রধানত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । তবে বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে । তদুপরি, শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক সম্পদের অন্তর্ভুক্তি এবং বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করে তুলছে ।

১৪.৩ শিক্ষণশিক্ষণ উপকরণ ও তার গুরুত্ব- (Teaching-Learning Materials and their importance)

শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণ মূলত চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—

১. পাঠ্যপুস্তক

২. মাল্টিমিডিয়া

৩. শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক সম্পদ

৪. প্রতিকারমূলক শিক্ষণ

এগুলো শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করে, জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করে এবং শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে।

১৪.৪ পাঠ্যপুস্তকশিক্ষার মূল ভিত্তি : (Textbook: Fundamental basis of Education)

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি পাঠ্যক্রম অনুসারে নির্ধারিত জ্ঞান সরবরাহ করে এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে শিখতে সহায়তা করে। পাঠ্যপুস্তকের সুবিধাগুলো হলো—

- এটি নির্ভরযোগ্য ও সুসংগঠিত তথ্য সরবরাহ করে ।

- শিক্ষার মূল কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

- শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয় ।

তবে পাঠ্যপুস্তকের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন, এটি সাধারণত একমুখী শিক্ষাদানের ওপর নির্ভরশীল এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে সাথে সাথে প্রতিফলিত করতে পারে না । তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষণ উপকরণের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ ।

১৪.৫ মাল্টিমিডিয়াআধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ :

মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলে । এটি টেক্সট, চিত্র, অডিও এবং ভিডিওর সমন্বয়ে শেখার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে ।

মাল্টিমিডিয়ার কিছু সুবিধা:

- পাঠ্যভিত্তিক শিক্ষার তুলনায় বেশি ইন্টারঅ্যাকটিভ ।

- শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বাড়ায়।

- জটিল বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলে।

তবে, মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নির্ভর করে প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর ওপর । অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাব থাকায় এর ব্যবহার সীমিত হতে পারে ।

১৪.৬ শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক সম্পদের ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব না দিলে অনেক শিক্ষার্থী শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে পারে । বহুভাষিক শিক্ষণ উপকরণ শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে ।

বহুভাষিক শিক্ষার সুবিধা:

- শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার সঙ্গে শিক্ষার ভাষার সংযোগ ঘটায় ।

- শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে ।

- ভাষাগত বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে ।

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP, ২০২০) বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করেছে, যাতে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষা

গ্রহণ করতে পারে।

১৪.৭ প্রতিকারমূলক শিক্ষণশেখার ঘাটতি পূরণের কৌশল : (Remedial Teaching)

শ্রেণিকক্ষে সব শিক্ষার্থীর শেখার গতি সমান নয় । কেউ দ্রুত শিখতে পারে, আবার কেউ শিখতে কিছুটা সময় বেশি নেয় ।

প্রতিকারমূলক শিক্ষণ মূলত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ।

প্রতিকারমূলক শিক্ষণের কিছু কৌশল:

বিকল্প শিক্ষণ কৌশল: পাঠ্যবস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপন করা ।

ব্যক্তিগত গাইডেন্স: শিক্ষক দ্বারা বিশেষ সহায়তা প্রদান ।

ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রযুক্তি: মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শেখার ঘাটতি পূরণ।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তিগত শিক্ষণের সুযোগ দিলে শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (Tomlinson, ২০০১) ।

১৪.৮ সারাংশ (Summary)

শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণ কেবল তথ্যের বাহক নয়, বরং শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করলেও, মাল্টিমিডিয়া, বহুভাষিক সম্পদ এবং প্রতিকারমূলক শিক্ষণের ব্যবহারে শিক্ষাদান আরও কার্যকর হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষকে আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে এই উপকরণগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

১৪.৯ স্বমূল্যায়ন প্রশ্নাবলী- (Self-evaluation Questions)

১. শিক্ষণ-শিক্ষণ উপকরণের গুরুত্ব কী? ব্যাখ্যা করুন ।

২. পাঠ্যপুস্তকের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

৩. মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাকে কীভাবে কার্যকর করে তোলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন ।

৪. বহুভাষিক সম্পদের ব্যবহার শিক্ষায় কী প্রভাব ফেলে?

৫. প্রতিকারমূলক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ কৌশল কী?

১৪.১০ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Mayer, R. E. (২০০৯). Multimedia learning. Cambridge University Press.
- NEP. (২০২০). National Education Policy ২০২০. Ministry of Education, Government of India.
- Sahlberg, P. (২০১১). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press.
- Tomlinson, C. A. (২০০১). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD.

একক ১৫: শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন: প্রারম্ভিক মূল্যায়ন, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং ফল ভিত্তিক মূল্যায়ন; ফল প্রস্তুতি: স্কোরিং, গ্রেডিং এবং অন্যান্য উপাদান (Evaluationg Learner Achievement: Entry level evaluation, Continuous and comprehensive Evaluation, Outcome-based Evaluation, Preparing Results: Scoring, grading and Other Components)

১৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এককটির অধ্যয়নের শেষে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারবে সেগুলি হল:

১. শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের গুরুত্ব ও ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. প্রারম্ভিক মূল্যায়ন, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং ফল ভিত্তিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবে।

৩. শিক্ষণ-শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নয়নে মূল্যায়নের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৪. স্কোরিং, গ্রেডিং এবং ফল প্রস্তুতির অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।

৫. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১৫.২ ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন (Learner Proficiency Evaluation) শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ, যা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মাত্রা পরিমাপ করে। এটি শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি চিহ্নিত করা, শিক্ষণ কৌশল উন্নত করা এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন সাধারণত পরীক্ষা-ভিত্তিক ছিল, যেখানে শিক্ষার্থীর শেখার পরিমাণ মূলত নম্বর বা গ্রেড দ্বারা নির্ধারিত হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক শিক্ষানীতিগুলোর (যেমন: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০পর্যালোচনায় দেখা (মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরীক্ষার মাধ্য ,গেছেমে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রারম্ভিক মূল্যায়ন, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং ফল ভিত্তিক মূল্যায়নের ধারণা এখন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলো শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষকদের তাদের পাঠ পরিকল্পনা আরও কার্যকরভাবে সাজাতে সহায়তা করে।

১৫.৩ শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়নের ধরন

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত:

১. প্রারম্ভিক মূল্যায়ন (Entry-Level Evaluation)

২. ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE)

৩. ফল ভিত্তিক মূল্যায়ন (Outcome-Based Evaluation - OBE)

১৫.৩.১ প্রারম্ভিক মূল্যায়ন (Entry-Level Evaluation)

প্রারম্ভিক মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী জ্ঞান, দক্ষতা ও বোধের একটি পরিমাপক। এটি শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কারণ এটি শিক্ষককে নির্ধারণ করতে সহায়তা করে যে, শিক্ষার্থীরা নতুন বিষয়টি বোঝার জন্য কতটুকু প্রস্তুত।

উদাহরণ:

- শ্রেণিকক্ষে নতুন অধ্যায় পড়ানোর আগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।
- প্রবেশনার্থী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যায়ন পরীক্ষা।

১৫.৩.২ নিরবচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation – CCE)

কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে এটি সঠিক পরিকল্পনা, কাঠামো এবং কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে। এটি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক এবং সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করে। সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে—

১. মূল্যায়নের কাঠামো ও নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ

নিরবচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক মূল্যায়নের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। এটি শিক্ষকদের জন্য একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কাঠামোবদ্ধ করে।

২. ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ

মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে করা উচিত নয়, বরং নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণ, লিখিত কাজ, প্রকল্প, উপস্থাপনা, মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়।

৩. একাধিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার

CCE-এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—

- লিখিত পরীক্ষা ও কুইজ
- শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনা
- প্রকল্প ও গবেষণা কাজ
- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ ও আলোচনা
- সহপাঠ মূল্যায়ন (Peer Assessment)
- অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ

৪. শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের সুযোগ প্রদান

শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন করতে তাদের নিজেদের মূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া উচিত। এটি আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং শিক্ষার্থীদের শেখার দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. শিক্ষক ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন করে অভিভাবকদের সাথে পর্যালোচনা করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। অভিভাবকদের মতামত নিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব।

৬. প্রযুক্তি ব্যবহার করা

CCE কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রযুক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি, অনলাইন কুইজ, ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৭. নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা

মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তারা কীভাবে উন্নতি করতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করা দরকার।

৮. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

CCE কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের সঠিক প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি। তাদের মূল্যায়ন কৌশল, মূল্যায়নের সরঞ্জাম এবং ফিডব্যাক প্রদান সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার।

৯. মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ

নিয়মিত মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা এবং বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের ধারা নির্ধারণ করা যায় এবং তাদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমাধান প্রদান করা যায়।

১০. শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমানো

CCE শিক্ষার্থীদের উপর পরীক্ষা-ভিত্তিক চাপ কমিয়ে শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই এটি এমনভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা শেখাকে আনন্দদায়ক মনে করে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়।

১৫.৩.৩ ফলাফল-ভিত্তিক (Outcome-Based) মূল্যায়নের ধারণা

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়ন (Outcome-Based Evaluation – OBE) হল এমন একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি, যা নির্দিষ্ট শিক্ষাগত লক্ষ্য বা শিক্ষার্থীদের শেখার ফলাফল অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি শুধুমাত্র শেখার পদ্ধতি বা শিক্ষকের পাঠদানের কৌশলের ওপর নির্ভর না করে, শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা মূল্যায়ন করে।

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের মূল বৈশিষ্ট্য:

- ✅ শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ✅ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
- ✅ দক্ষতা ও বাস্তব জীবনের প্রয়োগযোগ্যতা বেশি গুরুত্ব পায়।
- ✅ শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রতিক্রিয়া (Feedback) প্রদান করা হয়।
- ✅ শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের ধাপ:

১. নির্দিষ্ট ফলাফল নির্ধারণ করা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অনুসারে কোন নির্দিষ্ট দক্ষতা বা জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্জন করতে হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ—

- গণিতের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক লেখার দক্ষতা
- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা

২. পাঠ্যক্রম ও শেখার কার্যক্রম তৈরি করা

নির্ধারিত ফলাফল অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৩. মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়, যেমন—

- লিখিত পরীক্ষা
- গবেষণা কাজ ও প্রকল্প
- বাস্তবজীবনের সমস্যা সমাধান
- ল্যাবরেটরি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ

৪. ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠদান উন্নত করা

শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে পাঠদান কৌশল পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা হয়, যাতে তারা নির্ধারিত ফলাফল অর্জন করতে পারে।

৫. শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল একাডেমিক জ্ঞান অর্জন করে না, বরং তাদের বাস্তব জীবনের দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের উপকারিতা:

✅ এটি শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফল উন্নত করে।

✅ এটি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে।

✅ এটি চাকরির বাজারের চাহিদার সাথে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মিলিয়ে প্রস্তুত করে।

✅ এটি শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করতে সাহায্য করে।

১৫.৪ রেজাল্টের প্রস্তুতিকরণ: স্কোরিং, গ্রেডিং, এবং অন্যান্য উপাদান

শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি এবং পারদর্শিতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো **রেজাল্টের প্রস্তুতিকরণ।** এই প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পারফরম্যান্স পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে, যার মধ্যে **স্কোরিং, গ্রেডিং**, এবং অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। সঠিকভাবে রেজাল্ট প্রস্তুত করা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, দুর্বলতা, এবং উন্নতির সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

স্কোরিং (Scoring) এর ধারণা

স্কোরিং হলো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র বা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট নম্বর প্রদান করার একটি পদ্ধতি। এটি পরিমাপের একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

স্কোরিং পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

- ✅ প্রতিটি প্রশ্ন বা কাজের জন্য পূর্বনির্ধারিত নম্বর থাকে।
- ✅ এটি সাধারণত নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসারে করা হয়।
- ✅ শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।
- ✅ এটি ব্যক্তিগত উন্নয়ন মূল্যায়নে সহায়ক।

স্কোরিং পদ্ধতির ধরণ:

- **রুব্রিক স্কোরিং (Rubric Scoring):** নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্কোর প্রদান করা হয়।
- **গণনাকৃত স্কোরিং (Numerical Scoring):** প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নম্বর নির্ধারিত থাকে এবং মোট নম্বর গণনা করা হয়।
- **সাবজেকটিভ স্কোরিং (Subjective Scoring):** রচনামূলক উত্তর বা সৃজনশীল কাজের মূল্যায়ন করা হয়।
- **অবজেকটিভ স্কোরিং (Objective Scoring):** একাধিক নির্বাচনী প্রশ্ন বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উত্তর থাকে।

গ্রেডিং (Grading) এর ধারণা ও পদ্ধতি

গ্রেডিং হলো শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পারফরম্যান্স শ্রেণিবদ্ধ করার একটি ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট স্কোরের জন্য একটি গ্রেড বরাদ্দ করা হয়। এটি শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক পারফরম্যান্স বুঝতে সাহায্য করে এবং মূল্যায়নকে আরও সহজ করে তোলে।

গ্রেডিং ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

- ✅ এটি শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি বিশ্লেষণে সহজ করে তোলে।
- ✅ এটি শিক্ষার্থীদের নম্বরভীতি কমায় এবং শেখাকে আরও মানসম্পন্ন করে।
- ✅ এটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে।

গ্রেডিং পদ্ধতির ধরণ:

1. **বর্ণানুক্রমিক গ্রেডিং (Letter Grading):** A, B, C, D, F ইত্যাদি গ্রেড প্রদান করা হয়।
2. **সংখ্যাগত গ্রেডিং (Numerical Grading):** ১ থেকে ১০ বা ১ থেকে ৫-এর মধ্যে গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

3. **বর্ণনামূলক গ্রেডিং (Descriptive Grading):** শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়া ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত মন্তব্যসহ মূল্যায়ন প্রদান করা হয়।
4. **ক্রাইটেরিয়ন রেফারেন্সড গ্রেডিং (Criterion-Referenced Grading):** পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে গ্রেড প্রদান করা হয়।
5. **নর্ম রেফারেন্সড গ্রেডিং (Norm-Referenced Grading):** নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর সাথে তুলনামূলকভাবে গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ একটি সাধারণ গ্রেডিং স্কেল:

নম্বরের পরিসীমা (%)	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৯০ - ১০০	A+	৪.০
৮০ - ৮৯	A	৩.৭৫
৭০ - ৭৯	B+	৩.৫
৬০ - ৬৯	B	৩.০
৫০ - ৫৯	C+	২.৫
৪০ - ৪৯	C	২.০
৩৩ - ৩৯	D	১.৫
৩২ বা কম	F	০.০

৬.৫.৩ অন্যান্য মূল্যায়ন উপাদান (Other Components of Evaluation)

স্কোরিং ও গ্রেডিং ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কিছু অতিরিক্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়, যা শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়ক।

১. পারফরম্যান্স মূল্যায়ন (Performance Assessment)

- ✅ শিক্ষার্থীদের প্রকল্প, গবেষণা, এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।
- ✅ এটি ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী।

২. সহপাঠ মূল্যায়ন (Peer Assessment)

- ✅ শিক্ষার্থীদের সহপাঠীরা তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে।
- ✅ এটি শিক্ষার্থীদের পরস্পরের শেখার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

৩. আত্ম-মূল্যায়ন (Self-Assessment)

- ✅ শিক্ষার্থীদের নিজেদের শেখার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়।
- ✅ এটি আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করে।

৪. গুণগত প্রতিক্রিয়া (Qualitative Feedback)

- ✅ শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট নির্দেশনা ও গাইডলাইন পায়।
- ✅ এটি শিক্ষার উন্নতি ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

৫. অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন (Participatory Evaluation)

- ✅ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাদের শেখার আগ্রহ মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

রেজাল্টের প্রস্তুতিকরণে স্কোরিং, গ্রেডিং এবং অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা পরিমাপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কোরিং পদ্ধতি নির্দিষ্ট নম্বর নির্ধারণ করে পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে, আর গ্রেডিং পদ্ধতি নম্বরকে সহজভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বোঝাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি পারফরম্যান্স মূল্যায়ন, সহপাঠ মূল্যায়ন, আত্ম-মূল্যায়ন এবং গুণগত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও সমৃদ্ধ করা যায়। শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও কার্যকর এবং মানসম্পন্ন করতে এই সকল মূল্যায়ন কৌশলের সমন্বিত ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

১৫.৫ সারাংশ (Summary)

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরীক্ষার নম্বর প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং শিক্ষকদের শিক্ষণ কৌশল উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের শেখার গতি বুঝতে সহায়তা করে, ফল ভিত্তিক মূল্যায়ন তাদের অর্জিত দক্ষতাগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ করে, এবং গ্রেডিং পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমায়।

১৫. ৬ স্ব-মূল্যায়ন প্রশ্নাবলী (Self-evaluation questions)

1. শিক্ষার মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?
2. নিরবচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক মূল্যায়ন (CCE) কীভাবে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে?
3. ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়নের (OBE) মূলনীতি কী এবং এটি প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে কীভাবে আলাদা?
4. স্কোরিং এবং গ্রেডিং-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

১৫. ৭ তথ্যসূত্র (Bibliography)

- Black, P., & Wiliam, D. (১৯৯৮). Assessment and classroom learning. Assessment in Education.
- NEP (২০২০). National Education Policy ২০২০. Ministry of Education, India.
- Tomlinson, C. A. (২০০১). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. ASCD.